NANA PRABANDHA

By

Late RAJKRISHNA MUKHARJI, M.A, B.L.

(*GOLD MEDALLIST IN PHILOSOPHY*).

Late Professor of English, History & Philosophy in the Presidency College, Calcutta.

Late Translator to the Government of Bengal. Joint Editor of Banga Darsan. Late Fellow of the Calcutta University, Etc.

Printed by Kishori Mohan Mondal at the Naba-Gouranga Press

104, Amherst Street, Calcutta.

সূচীপত্র

—ঃঃ(*)ঃঃ—

বিজ্ঞাপন

এই প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তৎসমস্ত একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে কোন কোন প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে সামান্য পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

কলিকাতা।
১৮৮৫ সাল, ২১ নবেম্বর।

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	
তিনি	তিন	২৯ পৃষ্ঠা প্রথম লাইন
বাকলি	বাকল	১৫৭ পৃঃ, ১৭ লাইন
বাকলি	বাকল	১৩৬ পৃঃ, ৭ লাইন

নানা প্রবন্ধ

—— ঃ০ঃ ——

ভারত মহিমা। *

——*(*)*——

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানব সমাজের কি বি
উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারত সন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ
আমরা জানি যে বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ য়িহুদী দেশ হইতে ধর্ম্ম
রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীসের নিকট হইতে বিজ্ঞান
সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলে উন্নতি
সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে কয়জন
লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা এতদ্বিষয়ের
সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত আমরা
প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞানের মূল; বিজ্ঞান শাস্ত্রের
যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ
করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হইয়াই জ্যোতিষের এত উন্নতি
তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যাদ্বারা ব্যক্ত করিতে
পারিয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার
করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এই
নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই রসায়ন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন
এক্ষণে দেখা যাউক, গণিত সম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য জনপদে যে সংখ্যালিখন প্রণালী চলিতেছে
ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদা

---

* বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ১০ সংখ্যা, মাঘ ১২৮১।

সংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তৎকৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন যে, পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। (১) ইউরোপবাসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এসিয়াটিক রিসার্চ্চের দ্বাদশ খণ্ডে এক জন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, "বাহাউল্ দিন ভারতবাসীদিগকে দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা ইহার প্রমাণ একখণ্ড আরবী কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এজন্য বলা ভাল যে সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারতবাসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।" (২)

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান ইউরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন; বীজগণিতের Algebra নামটী আরবী "আল্‌জিবর" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালী দেশীয় এক ব্যক্তি মুসলমানদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে ইউরোপখণ্ডে প্রচার করেন। (৩) আরবেরা যে বীজগণিতের স্রষ্টা নহেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দু এবং গ্রীক্ জাতির ছাত্র। তাঁহাদিগের নূতন আবিষ্ক্রিয়া কিছুই দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি,

---

(১) "The Hindus are distinguished in Arithmetic by the acknowledged invention of the decimal notation."—p. 142, *Elphinstone's History of India, Cowell's Edition.*

(২) "Bahauldin ascribes the invention of the numeral figures in the decimal scale to the *Indians.* As the proof commonly given of the *Indians* being the inventors of these figures is only an extract from the preface of a book of *Arabic* poems, it may be as well to mention that all the *Arabic* and *Persian* books of arithmetic ascribe the invention to the *Indians.*"—pp. 183 & 184. Vol. XII. *Asiatic Researches.*

(৩) "Leonardo of Pisa first introduced Algebra into Europe; he learned it at Bugia, in Barbary, where his father was a scribe in the custom house by appointment from Pisa; his book is dated A. D. 1202." —*Cowell's note to Elphinstone's History of India,* p. 145.

এবং গ্রীসদেশে দিওফান্তস নামক বীজগণিতকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যিনি আরব দেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন, তিনি যে ভারতবাসী-দিগের শিষ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন, "মহম্মদ বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথম বীজগণিত প্রকাশ করেন বলিয়া পরিচিত। তিনিই আল্‌মান্ সুরের রাজত্ব কালে আল্‌মামুনের সন্তোষার্থে একখানি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তিনি হিন্দুদিগের গণনা-তালিকা সংশোধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক গণনা-তালিকা প্রস্তুত করেন; এবং তিনি ভারতবর্ষীয় সংক্ষিপ্ত গণনা প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন।" (৪) যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদিগের নিকটে পদে পদে ঋণী, সে ব্যক্তি যে হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা করে নাই, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোলব্রুক সাহেবও এইরূপ বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, "গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে বীজগণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; আরবেরা বীজগণিতের স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাহারা যে অন্যের নিকটে ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত কথা এই যে তাহারা হিন্দুদিগের নিকট সংখ্যাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। তাহারা যে হিন্দুদিগের বীজগণিতও পাইয়াছিল, ইহা যেরূপ সম্ভব, যে গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।" (৫)

---

(৪) "Muhammad Ben Musa al Khuwarazmi is recognized among the Arabians as the first who made Algebra known to them. He is the same, who abridged, for the gratification of Almamun, an astronomical work taken from the Indian system in the preceding age, under Almansur. He framed tables, likewise, grounded on those of the Hindus, which he professed to correct. And he studied and communicated to his countrymen the Indian compendious method of computation." *Colebrooke's Dissertation prefixed to his translations from Sanscrit Algebra.*

(৫) "Priority seems then decisive in favor of both Greeks and Hindus against any pretensions on the part of the Arabians, who in fact, however prefer none, as inventors of Algebra. They were avowed borrowers in science; and by their own unvaried acknowledgment from the Hindus

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্‌মানসুরের রাজত্বকালে প্রথম আরবগণিতবেত্তা কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। (৬) ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহ মিহিরের মৃত্যু; এবং ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। (৭) সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতবর্ষীয় গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় গণিতপ্রাপ্তির পরে শত বর্ষাধিক কাল পর্য্যন্তও তাঁহারা গ্রীকগণিতের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, এবং প্রায় দুই শতাব্দী গত হইলে পর দিওফান্তসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলেন। (৮) অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছিল, এবং তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রেগরী আবুল ফরাজ নামক একজন আর্ম্মাণী খৃষ্টান লেখক বলেন যে রোমক সম্রাট্ জুলিয়ানের সময়ে দিওফান্তস্ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (৯) একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ৩৬০ খৃষ্টাব্দ দিওফান্তসের প্রাদুর্ভাব কাল; সুতরাং তিনি আর্য্যভট্টেরও শত বর্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্ট ভারতবর্ষের প্রথম গণিতবেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ

---

they learnt the science of numbers. That they also received the Hindu Algebra is much more probable than that the same mathematician who studied the Indian arithmetic and taught it to his Arabian brethren, should have hit upon Algebra unaided by any hint or suggestion of the Indian analysis."—*Colebrooke's Dissertation.*

(৬) "The first Arabian mathematician translated a Hindu book in the reign of the Khalif Almansur, A. D. 773." *Cowell's note to Elphinstone's India*, p. 145.

(৭) See a paper by the late Dr. Bhau Daji in the Journal of the Royal Asiatic Society. New Series Vol. I.

(৮) "The Arabs became acquainted with the Indian astronomy and numerical science before they had any knowledge of the writings of the Grecian astronomers and mathematicians; and it was not until after more than one century, and nearly two that they had the benefit of an interpretation of Diophantus, whether, version or paraphrase, executed by Muhammud Abulwafa al Buzjane." *Colebrooke's Dissertation.*

(৯) See Cowell's Edition of *Colebrooke's Essays* Vol. II. p. 399.

পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে দিওফান্তসের ছাত্র বলা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে কেবল দিওফান্তসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ নহে; তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ যে প্রকার বীজগণিতের জ্ঞান দেখাইয়াছেন, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হইত না। (১০) এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। দিওফান্তস্ ব্যতিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম বা গ্রন্থ কোথাও পাওয়া যায় না; এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিত বোধক একটী শব্দ নাই। (১১) গ্রীস দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে সন্দেহ হয় যে দিওফান্তস্ বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চ্চের দ্বাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, "১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেলি নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন; এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে তিনি এবং রোমের একজন উপদেশক দিওফান্তসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে আরবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন।" (১২) অতএব ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় Chemistry বা রসায়ন Alchemy হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু Alchemy (আলকেমী)

---

(১০) See Cowell's Elphinstone p. 143.

(১১) "We know of no Greek writer on Algebra, but Diophantus; neither he, nor any known author, of any age, or of any country, has spoken, directly or indirectly, of any other *Greek* writer on Algebra in any branch whatever; the Greek language has not even a term to designate the science."—p. 163 Vol. XII. *Asiatic Researches.*

(১২) "In 1579 Bombelli published a treatise of Algebra, in which he says, that he and a lecturer at Rome, whom he names, had translated part of Diophantus, adding, 'that they had found that in the said work the *Indian* authors are often cited; by which they learnt that this science was known among the *Indians* before the *Arabians* had it." P. 161 Vol. XII, *Asiatic Researches.*

নামটী আরবী। ইহাতেই জানা যাইতেছে যে আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ রসায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে এবিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসা গ্রন্থ। আরবেরা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চরক এবং সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়; এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদশাহ হারনাল রসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন। (১৩) হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল, যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল; তাম্র, লৌহ, সীসক, রাং এবং দস্তার অম্লজানজ ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। (১৪) এই পদার্থ-গুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন; এবং এ নামটী কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওশানসী লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে;—'এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা সস্তায় সোডা, হরিতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক, এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধি

---

(১৩) "The earliest medical writers extact are Charaka and Susruta. ...These authors were translated into Arabic, and probably soon after that nation turned its attention to literature. The Arab writers openly acknowledge their obligations to the medical writers of India...It helps to fix the date of their becoming known to the Arabs, to find that two Hindus, name Manka and Saleh' were physicians to Harun al Rashid in the eighth century."—*Cowell's Elphinstone* p. 159.

(১৪) "They knew how to prepare sulphuric acid, nitric acid, and muriatic acid; the oxide of copper, iron, lead—tin and zinc; the sulphuret of iron, copper, mercury, antimony, and arsenic; the sulphate of copper, zinc, and iron; and carbonates of lead and iron," Ibid p. 159.

পাইতেছি। বস্তুতঃ, যে সময়ে ইউরোপে অল্প ব্যয়ে গান্ধিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।" (১৫)

একণে দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপখণ্ডে যে প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইতেছে, তাহারও উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কুমারিল্ল ভট্ট লিখিয়াছেন,

"প্রজাপতি স্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়-বেলায়ামুষস্যুত্মন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষসংযোগবদুপচারঃ। সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্য্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

অর্থাৎ

"প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে ঊষার উৎপত্তি, এজন্য ঊষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। ঊষার সহিত তাঁহার তেজঃসংযোগ ঘটে, এজন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহনি অর্থাৎ দিনে লয় হয় বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নহে।"

যে ভট্ট মোক্ষমুলর ইউরোপে দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যার পথ খুলিয়াছেন, তিনিই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থে উপরিধৃত সংস্কৃত পংক্তি কতিপয় প্রথমে

---

(১৫) "By the assistance of this acid we prepare almost all the others; for instance, the nitric, muriatic, tartaric, citric, &c. We owe to it the cheapest mode of obtaining artificial soda, chlorine, and its bleaching compounds. It is essential to the processes of the dyer, and to it we are indebted for many of the best remedies we can command—of which calomel, corrosive sublimate, sulphate of quinine, the ethers, &c. may be cited as examples. In fact, from the time that sulphuric acid was first prepared at a cheap price in Europe, may be dated the commencement of her greatness in all chemical manufactures."

O 'Shaughnessy's Manual of Chemistry p. 192.

উদ্ধৃত করিয়াছেন; (১৬) এবং উহা হইতেই যে তিনি দেবতত্ত্বের সৌরব্যাখ্যা অবলম্বন করিতে শিখিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

৮) ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটি বর্ণমালা আছে। চীনদেশীয়, ফিনিসীয়, এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদি, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বৎ, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটি যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টিরোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"; মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক কাহাকেও কষ্ট দিবে না, সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া,

(১৬) Ancient Sanscrit Literature by Professor Max Muller.

তুষারমণ্ডিত, মেঘভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল, পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সত্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্যজাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিত-সাধন ব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বুদ্ধদেব প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন। পরে য়িহুদীদেশীয় ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি নরজাতি পর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বুদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধশিষ্যগণ অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শত্রুপ্রদত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু অস্ত্রদ্বারা, শারীরিক বিক্রম দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট্‌ ছিলেন; পাষাণস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, তাহাতে লোকের মঙ্গলসাধনার্থে যে প্রকার যত্ন এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতিদিগকেও লজ্জা পাইতে হয়, সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন; কিন্তু যে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভাগে বুদ্ধদেব প্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্প দিন হইল

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য, গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং জাপানবাসিগণ মহোৎসাহসহকারে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়াখণ্ডের পুনর্জ্জীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ উপকার করেন নাই এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালী। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তাহাদিগের পূজা হইয়া থাকে; এবং তথায় যে কবিভাষা প্রচলিত তাহাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে য়িহুদী, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্যসমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে কার্পাস শিল্পজাতের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে ঋগ্বেদ প্রায় খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চদশশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, তাহাতেও তন্ত্রস্থিত কার্পাস বস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাস বস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল। (১৭) এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য-জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত

(১৭) "India is, according to our knowledge, the accredited birth-place of cotton manufacture. In one of the hymns of the Rigveda, said to have been written fifteen centuries before our era, reference is made to *cotton in the loom* there, at which early date therefore it must have acquired some considerable footing."—p. 347, Vol. XVII, Journal of the Royal Asiatic Society.

এতেই দৃষ্ট হয় যে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যানচেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটা ফোঁটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারত-সন্তানগণ, ভারতের পূর্ব্বমহিমা স্মরণপূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

বিদ্যাপতি।*

বিদ্যাপতি বঙ্গ কাব্যকাননের পিকবর। তাঁহার সঙ্গীতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই সরস কবিতাকুসুমের বাসন্তসৌরভ বাঙ্গালায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়াই কত ভাবুক বিহঙ্গ ও মধুকর সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কত শত ভক্তের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে; কত প্রেমিকের পুলকিত তনু অতুল আনন্দানিলহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়াছে। যখন অমৃতময় স্বর-লহরী বিস্তার করিয়া কোকিল ঋতুরাজের আগমন বার্ত্তা দেয়, সে কি বলে বুঝি না বুঝি তাহার স্বরে মন মোহিত হয়, হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; সেইরূপ যখন বিদ্যাপতির গীত শ্রবণ করি, ভাল করিয়া বুঝি, না বুঝি, তাহাতে মন মুগ্ধ হয়, হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্র পর্য্যন্ত বাজিয়া উঠে। এই কলকণ্ঠ ভাবুক পিকবরের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আমরা অনুসন্ধান দ্বারা যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিব। আমরা যাহা বলিব, হয়ত তাহাতে অনেকের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, অনেকের চিরসঞ্চিত বিশ্বাসের মূলে

---

* বঙ্গদর্শন, চতুর্থ খণ্ড ২ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২।

কুঠারাঘাত পড়িবে। এতকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত আমরা ঐকমত্য রাখিতে পারিব না।

বিদ্যাপতি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। তবে ইহা জানা আছে যে তিনি চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কবি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক লোক ছিলেন, এবং তিনি শিবসিংহ নামক রাজা ও লছিমা নাম্নী রাজ্ঞীর আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আর রূপনারায়ণ নামে তাঁহার একজন বন্ধু ছিল। বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের লেখা হইতে এ সকল কথা সংগ্রহ করা যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥ মধ্যখণ্ড।

চৈতন্য চরিতামৃতের এই এবং অন্যান্য কয়েকটী স্থল পাঠ করিয়া জানিতে পারা যায় যে চৈতন্য দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা শ্রবণ করিতে ভাল বাসিতেন। ভাল বাসিবারই কথা। চৈতন্য যেমন কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক, কৃষ্ণরসের রসিক, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসও তেমনই কৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রীতির উৎস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতায় তাহা বেগবতী নদী হইয়াছে। প্রেমের পাগল গৌরচন্দ্র কেন না তাঁহার রস পান করিতে উৎসুক হইবেন? নরহরিদাস লিখিয়াছেন,

জয় বিদ্যাপতি কবিকুলচন্দ।
রসিক সভাভূষণ সুখকন্দ॥
শ্রীশিবসিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগত ব্যাপি রহু বিশদ চরিত॥
লছিমা গুণহি উপজে বহুরঙ্গ।
বিলসয়ে রূপনারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন নব কেলি বিলাস।
করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ॥

শ্রীগোকুলবিধু গৌর কিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহরি ভণ অরু কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥

বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন,

জয় জয় দেব কবি, নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস, রসশেখর,
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা
রায় স্বরূপ সহিত।
যবহু যে ভাব উদয় তুহুঁ অন্তরে,
তব গায়ই তুহু মেলি।
শুনইতে দারু পাষাণ গলি যায়ত,
ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপতে, যতন করি পহুঁ মোর
জগতে করল পরকাশ।
সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

কবিপতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীত, জগতচিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদসঞ্চয়ে,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরিমাণি॥
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া

সো সুরসার, হার সব রসিকহি,
কণ্ঠহি কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া।
আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সে আনন্দরস, জগভরি বরিখল,
সুখময় বিদ্যাপতি রসমেহা॥
যত যত রসপদ কয়লহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি, শ্রবণপর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে॥
সোরস শুনি নাগর বরনারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পু বিথারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, বহইতে আনমন,
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥

আমরা বৈষ্ণব কবিদিগের যে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তদ্দৃষ্টে এই কয়েকটী কথা জানা যাইতেছে, (১) বিদ্যাপতির রচিত গীত শ্রবণে অনেক ভক্তের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; (২) চৈতন্য সর্ব্বদাই ঐ সকল গীত শুনিতেন; (৩) শিবসিংহ নৃপতি ও লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির সদ্ভাব ছিল; (৪) রূপনারায়ণের সহিত তাঁহার সখ্য ছিল। এক্ষণে দেখা যাউক, বিদ্যাপতির লিখিত কবিতা হইতে তাঁহার কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়,

কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥

কোথাও এরূপ,

ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ;
লছিমা দেবী পরমাণ॥

কোথায় এপ্রকার,

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন সব যুবতী

ইহ রসকূপ যে জান।

রাজা শিব সিংহ, রূপ নারায়ণ,

লছিমা দেবী পরমাণ॥

কোন স্থলে ঈদৃশ,

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মুরতি,

রাধারূপ অপারা।

রাজা শিবসিংহ, রূপ নারায়ণ,

একাদশ অবতারা॥

কুত্র বা এবম্বিধ,

রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।

ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥

কোথাও এপ্রকার,

বিদ্যাপতি কহ ভাখি।

রূপনারায়ণ সাখি॥

এইরূপ বিদ্যাপতি লিখিত অনেক কবিতা হইতে জানিতে পারা যায় যে রাজা শিবসিংহ, লছিমা দেবী ও রূপনারায়ণের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব ছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় পুরুষপরীক্ষা নামক একখানি গদ্য পুস্তক আছে; উহার প্রারম্ভ এই প্রকার, "অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করেন এবং দেবতাদিগের পূজিত চন্দ্রশেখর যাঁহাকে পূজা করেন ও নারায়ণ দেবগণের ধ্যান প্রাপ্ত হইয়াও যাঁহাকে ধ্যান করেন এতাদৃশী যে পরম দেবতা তাঁহার চরণে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি। শূরসমূহের মান্য ও মেধাবিশ্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত সমুদায়ের মধ্যে প্রথম গণনীয় যে শ্রীদেবসিংহ রাজার পুত্র শ্রীশিবসিংহ রাজা তিনি জয়যুক্ত হউন।

"অভিনব প্রজ্ঞা বিশিষ্ট বালকদিগের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত এবং কামকলা কৌতুকবিশিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্ত শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন যে রসজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মলবুদ্ধি যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা নীতিবোধানুরোধক যে এই সকল

বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার এই রচিত গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন। যে গ্রন্থের লক্ষণোক্ত পরীক্ষার দ্বারা পুরুষ সকলের পরিচয় হয় এবং যে গ্রন্থের কথা সকল লোকের মনোরমা সেই পুরুষপরীক্ষা নামে পুস্তক রচনা করা যাইতেছে।"

এইরূপ বাঙ্গালা গদ্যে কবি বিদ্যাপতি পুরুষপরীক্ষা রচনা করিয়াছেন, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু এটা ভ্রম। ভ্রম বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহও করিয়াছেন, অথচ কোন পক্ষেই কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আমরা কেন ভ্রম বলিতেছি নিম্নে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।—

(১) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষা আছে। পুস্তকখানি এক্ষণে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রহিয়াছে। ঐ পুস্তকের উপরে লিখিত আছে,

"শ্রীযুক্ত বিদ্যাপতি পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংস্কৃত বাক্যে সংগৃহীতা পুরুষপরীক্ষা। শ্রীহরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে রচিতা।"

(২) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিহাস (Annals of the College of Fort William) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায় যে হরপ্রসাদ রায় মূল সংস্কৃত হইতে পুরুষপরীক্ষা বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উহা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কৌন্সিলের অভিপ্রেতানুসারে গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে শ্রীরামপুর মিসনরী যন্ত্রে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। *

---

* In a Catalogue of Literary works, the publication of which has been encouraged by Government at the recommendation of the council of the College of Fort William, since the period of disputation, held in 1814", we find the following :—

"পুরুষপরীক্ষা Pooroosh Pareeksha or the Test of man, a work containing the moral doctrines of the Hindus, translated into the Bengalee Language, from the Sanskrit, by Huruprasad, a Pundit attached to the College of Fort William, for the use of the Bengalee class. It is a delineation of eminence of character, in many situations of human life, and consists of forty-eight stories, illustrative thereof. Some of these describe men eminent for moral virtue ; others, men eminent for heroic or daring actions ; others are represented as examples of high qualifications ; and others, of extraordinary folly or wisdom, virtue or vice.—The whole forming a useful miscellany of Eastern manners and opinions". p. 474, Annals of the College of Fort William.

In Appendix—No. II of the same work, giving a "Catalogue of Oriental and other works, which have been published under the patronage

(৩) আমরা সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উহা হইতে যে পূর্ব্বপ্রদত্ত বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষার সূচনা অনুবাদিত, পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মঙ্গলাচরণ।

"ব্রহ্মাপি যাং নৌতি নুতঃ সুরেণ
যামর্চ্চিতোপ্যর্চয়তীন্দুমৌলিঃ।
যাং ধ্যায়তি ধ্যানগতোপি বিষ্ণু
স্তমাদিশক্তিং শিরসা প্রপদ্যে॥
বীরেষু মান্যঃ সুধিয়াং বরেণ্যো
বিদ্যাবতামাদিবিলেখনীয়ঃ।
শ্রীদেবসিংহক্ষিতিপালসূনু
র্জীয়াচ্চিরং শ্রীশিবসিংহদেবঃ॥"

"শিশূনাং সিদ্ধ্যর্থং নয়পরিচিতে নূতনধিয়াং
মুদে পৌরস্ত্রীণাং মনসিজকলাকৌতুকযুষাম।
নিদেশান্নিঃশঙ্কং সপদি শিবসিংহক্ষিতিপতেঃ
কথানাং প্রস্তাবং বিরচয়তি বিদ্যাপতিকবিঃ॥
নয়ানুরোধেন গুণেন বাপি
কথারসস্যাপি কুতূহলেন।
বুধোপি বৈদগ্ধ্যবিশুদ্ধচেতাঃ
প্রবন্ধমাকর্ণয়তাং ন কিম্মে॥
পুরুষাঃ পরিচীয়ন্তে যুক্তেরস্যাঃ পরীক্ষয়া।
তৎপুরুষপরীক্ষায়াং কথা সর্ব্বজনপ্রিয়া॥"

পুরুষপরীক্ষালেখক বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের আশ্রিত; গীতরচয়িতা বিদ্যাপতিও রাজা শিবসিংহের আশ্রিত। সুতরাং পুরুষপরীক্ষালেখক ও গীতরচয়িতা একই ব্যক্তি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অন্ততঃ যত-

---

of the College of Fort William, since its Institution, in 1800, we find the follwing :

"পুরুষপরীক্ষা Pooroosh Pureeksha, translated from the original Sanskrit, by Huruprusadu Rayu Serampore, printed at the Mission Press, 8 Vot. 1815.

ক্ষণ অন্যরূপ প্রমাণ না পাওয়া যাইতেছে, ততক্ষণ এইরূপ বিবেচনা করাই যুক্তিসিদ্ধ; কারণ বিভিন্ন পাত্রস্থলে গ্রন্থকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা উভয়ের নামের ঐক্য হওয়া অতীব অসম্ভব। পুরুষপরীক্ষা হইতে রাজা শিব-সিংহের একটী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তিনি রাজা দেবসিংহের পুত্র।

বিদ্যাপতি কবি চণ্ডীদাসের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। উভয়ের গুণের কথা শুনিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হন। উভয়ের মিলন সম্বন্ধে চারিটী কবিতা আছে; তন্মধ্যে আমরা দুইটী উদ্ধৃত করিলাম; একটী রূপনারায়ণের, অপরটী বিদ্যাপতির রচিত।

(১)

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতিগুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাসগুণ,
দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল,
বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব, রহই না পারই,
চলল দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গাওত,
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহুঁ জাগি॥
দৈবহি দুহুঁ দোঁহা, দরশন পাওল,
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম, শ্রবণে তহি জানল,
রূপনারায়ণ গোই॥

(২)

সময় বসন্ত, যামদিন মাঝহি
বটতলে সুরধুনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল,
পুলকে কলেবর গীর॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।

সঙ্গহি রূপনারায়ণ।কেবল,
দুহুঁক অবশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ, নিভৃতে আলাপই,
পুছত মধুর রস কি?
রসিক হইতেোকিয়ে, রস উপজায়ত,
রস হইতে রসিক কহি?
রসিকা হইতে, রসিক কিয়ে হোয়ত,
রসিক হৈতে রসিকা?
রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হৈতে রতি কিয়ে,
কাহে নানব অধিকা?
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে,
শুনত রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ,
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

আমরা যে দুইটী গীত উদ্ধৃত করিলাম না, তন্মধ্যে একটীর ভণিতা এইরূপ,

রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ,
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি, দুহুঁক করু বর্ণন,
তছু পদ কমলভৃঙ্গ।

সুতরাং এটীর রচয়িতা চারিজন, রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ, বৈদ্যনাথ ও শিবসিংহ; এই চারিজনই বিদ্যাপতির মিত্র হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বীরভূমস্থ নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের বাসস্থান ছিল। অতএব বিদ্যাপতির বাসস্থান বীরভূম জেলা হইতে অতিদূরবর্ত্তী ছিল না, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে।

এস্থলে আর একটী কথার বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়েই এক সময়ের লোক; চণ্ডীদাসের লেখার সঙ্গে বর্ত্তমান বাঙ্গালার অল্পই প্রভেদ, কিন্তু বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির ভাব

অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উভয়ের রচনা প্রণালীগত বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা উভয়েরই দুইটী করিয়া কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম ও দ্বিতীয়টী চণ্ডীদাসের, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ টী বিদ্যাপতির।

(১)

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিট করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

(২)

ধিক রহু জীবনে যে পরাধিনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল:
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতাসনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥

যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাসে বলে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ পিরীতি সেই ধরই পরাণ॥

(৩)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দলবলে ধনী দেকে পড়ি গেল॥
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ বিথার।
কবহু বাঁধয়ে কুচু কবহুঁ উঘার॥
থির নয়ান নাহি অথির ভেল।
উরজ উদয় থল নালিম দেল॥
চঞ্চল চরণ চিত চঞ্চল ভাণ।
জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥

(৪)

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহ না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক ॥

যদিও চণ্ডীদাসের কোন কোন গীতে হিন্দির আধিক্য লক্ষিত হয়, এবং বিদ্যাপতির নামবিশিষ্ট কোন কোন কবিতা বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় রচিত, তথাপি সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের লেখা বাঙ্গালা ও বিদ্যাপতির লেখা হিন্দিভাবাপন্ন। এরূপ হইবার কারণ কি বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। পূর্ব্বে কেহ কেহ বলিতেন যে বিদ্যাপতির সময়ে বাঙ্গালা ভাষা হিন্দি হইতে পৃথগ্‌ভূত হয় নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের রচনাপদ্ধতি দেখিলে এ বিশ্বাস কাহারও মনে স্থান পাইতে পারে না। চণ্ডীদাসের শব্দ বাঙ্গালা, চণ্ডীদাসের ছন্দ বাঙ্গালা। বিদ্যাপতির শব্দ হিন্দি, বিদ্যাপতির ছন্দ হিন্দি। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কৃষ্ণবিষয়ক গীত রচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতি ব্রজভাষার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিতায় হিন্দির আধিক্য; চণ্ডীদাস তাঁহার ন্যায় বিদ্বান্ ছিলেন না বলিয়াই অনেক ব্রজবুলি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই মতের সমর্থন করেন, তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন যে চৈতন্যের পরেও, এমন কি এখন পর্য্যন্ত, বঙ্গীয় কবিরা উক্তপ্রকার হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা সময়ে সময়ে রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে আর একটী কথা ভাবিতে হয়। বিদ্যাপতির গীতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে গিয়াই পরবর্ত্তী কবিরা হিন্দিভাবাপন্ন কবিতা লিখিয়াছেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বের কোন বাঙ্গালা কবিতা বা কবির উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাপতিকেই হিন্দিভাবাপন্ন করিয়া লিখিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মাতৃভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত, তিনি যে তাঁহার অধিকাংশ গীতগুলিকে ছন্দে ও শব্দে হিন্দি ভাবাপন্ন করিতে যাইতেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। আদি কবিরা স্বদেশীয়দিগের বোধগম্য করিয়াই গীত রচনা করেন; তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তিবশতঃ পরবর্ত্তীকালের বা দূরতর প্রদেশের কোন কোন লেখক তাঁহাদিগের রচনাপ্রণালী সর্ব্বসাধারণের দুর্ব্বোধ হইলেও বিশেষ পাঠকশ্রেণীর জন্য অনুকরণ করিতে পারেন। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় ভাষা যে প্রদেশে প্রচলিত ছিল, তিনি সে প্রদেশের

অধিবাসী হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যাপতি বীরভূম জেলায় চণ্ডীদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আমরা দেখাইয়াছি যে চণ্ডীদাসের ভাষা বাঙ্গালা। অতএব বীরভূম হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলাভিমুখে গমন করিলে বিদ্যাপতির বাসস্থলে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয়। "খেলত," "ভেল," "কহব," "মাতল," "শ্রবণক," ইত্যাদি পদ প্রয়োগ দেখিয়াও বোধ হয় বিদ্যাপতি ভাগলপুর বা পাটনা বিভাগের লোক।

এ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই কয়েকটী কথা পাওয়া যাইতেছে; (১) তিনি চৈতন্যের পূর্ব্বে ও চণ্ডীদাসের সময়ে শিবসিংহ নামক কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত রাজার মহিষীর নাম লছিমা ও পিতার নাম দেবসিংহ ছিল; (২) রূপনারায়ণ, বিজয়-নারায়ণ ও বৈদ্যনাথ বিদ্যাপতির মিত্র ছিলেন; (৩) বিদ্যাপতি অনেক পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা রচনা করেন; (৪) তিনি পাটনা বা ভাগলপুর বিভাগের লোক হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বিদ্যাপতির বাসস্থল মিথিলায় ছিল।

মৈথিল ভাষায় লিখিত বিদ্যাপতির রচিত অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে; সে সকল গীতে শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লছিমা দেবীর নামোল্লেখ আছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম—

অরুণ পূরব দিশ, বহল সগর নিশ,
গগন মগন ভেল চন্দা।
মুনি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি,
মুনল মুখ অরবিন্দা॥
কমর বদন, কুবলয় দুই লোচন,
অধর মধুরি নিরমাণে।
সকল শরীর, কুসুম তুঅ সিরজিল,
কিঅ দঈ হৃদয় পখাণে॥
অসকতি কর, কঙ্কণ নহি পরিহসি,
হৃদয় হার ভেল ভারে।
গিরিসম গরুঅ, মান নহি মুঞ্চসি,
অপরুব তুঅ ব্যবহারে॥

অব গুণ পরিহরি, হরখি হরু ধনি
মানক অবধি বিহানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ,
বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥

আর একটী গীতের ভণিতা এইরূপ,

ভণই বিদ্যাপতি, সুনু ব্রজ যৌবতি,
ইথিক লক্ষ্মী সমানে।
রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ, লছিমাদেই
বিরমাণে॥ বর্ত্তমান

অপর একটী কবিতার ভণিতা এবম্বিধ,

ভণই বিদ্যাপতি, শুন ব্রজনারি।
ধৈরজ ধরয়কু মিলত মুরারি॥

মিথিলায় পঞ্জীনামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে; তাহাতে রাজাদিগের ও ব্রাহ্মণগণের পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৪৮ শকে মিথিলাধিপতি হরসিংহ দেবের রাজত্ব সময়ে উক্ত গ্রন্থের রচনারম্ভ হয়; উহাতে লিখিত আছে,

শাকে শ্রীহরিসিংহদেবনৃপতেঃ ভূপার্ক তুল্যেজনি।
তস্মাদ্দন্তমিতেহব্দকে দ্বিজগণৈঃ পঞ্জীপ্রবন্ধঃ কৃতঃ॥

অর্থাৎ "১২৪৮ শাকে হরিসিংহ দেব নৃপতির সময়ে দ্বিজগণকৃত পঞ্জী-প্রবন্ধের জন্ম হয়।"

এই পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় আছে। তাঁহার পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত, প্রপিতামহের নাম ধীরেশ্বর, বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম দেবাদিত্য, এবং অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ধর্ম্মাদিত্য। তিনি মিথিলা-মহীপতি শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন। পঞ্জী প্রবন্ধানুসারে, এই রাজা মৈথিল ব্রাহ্মণবংশীয়; লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী; রাজা দেবসিংহ তাঁহার পিতা, এবং তিনি ১৩৬৯ শকে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন।

শিবসিংহ নৃপতি সুগওনা নামক গ্রামে বাস করিতেন। অদ্যাপি সেই গ্রামে তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া বাস করিতেছে। তৎখনিত বিস্তৃত অতি গভীর রাজপুষ্করিণী নামে অনেক তড়াগ দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহাদিগের সদৃশ বৃহৎ জলাশয় দেশান্তরে প্রায় দেখা যায় না। মিথিলায় এই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,

"পোখরি রজোখরি অরু সভ্ পোখরা।
রাজা শিবসিংহ অরু সভ্ ছোকরা॥"

অর্থাৎ "রাজখনিত পুষ্করিণীই প্রকৃত পুষ্করিণী, আর সকল ডোবা; শিবসিংহই প্রকৃত রাজা, আর সকল সামান্য লোক।"

রাজা শিবসিংহ ও কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে মিথিলায় একটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। কথিত আছে যে রাজা শিবসিংহকে দণ্ড দিবার জন্য দিল্লীশ্বর ধরিয়া লইয়া যান। বিদ্যাপতি এই সংবাদ শুনিয়া রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত দিল্লীতে গমন করেন। যাইয়া দিল্লীপতিকে বলেন, আমি অদৃষ্ট দৃষ্টবৎ বর্ণনা করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া দিল্লীশ্বর পরীক্ষার্থে তাঁহাকে কাষ্ঠপেটকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া কোন স্থানে রাখিয়া দেন। অনন্তর কতকগুলি নগরাঙ্গনাকে স্নান করাইয়া নিজ নিজ ভবনে পাঠান, এবং কবিকে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক যমুনাতীরবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে আদেশ করেন। বিদ্যাপতি নাকি ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দপ্রসাদে, উহা অদৃষ্ট হইলে, দৃষ্টবৎ মৈথিল ভাষায় এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন,

কামিনী করু অসনানে।
হেরইত হৃদয় উদিত পচবাণে॥
চিকুর গরল জলধারে।
জনি মুখশশি ডর রোঅহি অন্ধারে॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
জনি বিহ আনি মিলাওল দেবা॥
জনি সংশয় ভুজ ফাঁসে।
বান্ধি ধএল উড়ি লাগত অকাসে॥
তিতল বসন তন লাগু।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগু॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বড় তপ গুণমতি পুনমতি পাবে॥

বিদ্যাপতির এই গীতটী বাঙ্গালা দেশেও চলিত আছে; কিন্তু ইহার

সম্বন্ধে কোন গল্প কাহার মুখে শুনা যায় না, এবং এদেশে ইহার যেরূপ আকার হইয়াছে নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

কামিনী করয়ে সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ॥
চিকুরে গলয়ে জলধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে অন্ধিয়ারা॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনি এক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥*

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, বিদ্যাপতির অলৌকিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া, দিল্লীশ্বর শিবসিংহকে মুক্ত করিলেন এবং কবিকে বীসপী নামক বৃহৎ গ্রাম প্রদান করিলেন। এই কারণে হউক বা না হউক, বিদ্যাপতি যে গ্রাম দান পাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদ্বংশীয়ের অদ্যাপি উক্ত গ্রাম ভোগ করিয়া বাস করিতেছেন; তাঁহারা দিল্লীপতিদত্ত দানপত্র অদ্যাপি দেখাইয়া থাকেন। রাজা শিবসিংহ নিজভূম্যন্তর্গত সেই গ্রামের দিল্লীপতিদত্ত দানপত্র দৃঢ় করণার্থে আপনিও কবিকে একখানি দানপত্র দেন; তাহা হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে,

অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে শুভতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাস্সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যাপ্রসিদ্ধে পুরে
দিৎসোৎসাহবিবৃদ্ধবাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যে সভম্॥
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং
সারণ্যং সসরোবরঞ্চ বীসপীনামানমাসীমতঃ।

* প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ। ১৫ পৃষ্ঠা।

শ্রীবিদ্যাপতিশর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী
বীরঃ শ্রীশিবসিংহদেবনৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনম্ ॥

অর্থাৎ

"২৯৩ লক্ষ্মণ সেন ভূপতির অব্দে শ্রাবণ মাসে শুভতিথিতে শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে বাগ্মতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতী প্রজ্ঞাবান্ দানোৎসাহযুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহ দেব নৃপতি সভামধ্যে বসিয়া সভ্য সুকবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোর্ব্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য সসরোবর বীসপী নামক গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসনস্বরূপ প্রদান করিলেন।"

পাঠকগণ দেখিবেন যে, রাজা শিবসিংহের দানপত্রে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ ব্যবহৃত। বাঙ্গালার সেন রাজারা যে, মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা তদ্বিষয়ের সামান্য প্রমাণ নহে। মিথিলা হইতে আমরা আরও সংবাদ পাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি কবি ৩৪৯ লক্ষ্মণসেনাব্দে মৈথিলাক্ষরে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে গিয়া দুইবার লক্ষ্মণ সেনের অব্দের উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগের জানিতে ইচ্ছা হয় যে, এক্ষণে ত্রিহুতে লক্ষ্মণ সেনের অব্দ প্রচলিত আছে কি না। অনুসন্ধান দ্বারা পরে আমরা অবগত হইয়াছি যে, মৈথিল পণ্ডিত সমাজে অদ্যাপি মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের অব্দ চলিতেছে। উহার চিহ্ন "লসং।" মাঘ মাসের প্রথম দিন হইতে উহার বৎসর পরিবর্ত্তন ঘটে। এক্ষণে* ৭৬৭ লক্ষ্মণ সংবৎ চলিতেছে। এ সময়ে শকাব্দ ১৭৯৭ ও খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪ বর্ষ বহমান। সুতরাং শকাব্দ ১০৩০ ও খৃষ্টাব্দ ১১০৭ লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল হইতেছে। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান দ্বারা খৃঃ অঃ ১১০০ হইতে ১১২০ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব সময় ধরিয়াছেন। মিথিলায় প্রচলিত লক্ষ্মণাব্দ দ্বারা তাঁহার মতেরই সমর্থন হইতেছে।

১০৩০ শকাব্দে লক্ষ্মণাব্দের আরম্ভ। সুতরাং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে ১৩২৩ শকাব্দ হইতেছে। যদি শেষোক্ত বৎসর রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি কবিকে ভূমিদানপত্র দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন, মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে এরূপ উক্তি কেন দেখা যায়?

* অর্থাৎ ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে।

ইহাতে ত তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে দান করিতে দেখা যাইতেছে। মৈথিল পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে এই দানপত্র তাঁহার যৌবরাজ্যকালে প্রদত্ত। শিবসিংহ অনেক আয়াসসাধ্য কার্য্য করিয়াছিলেন, এ প্রকার জনশ্রুতি আছে। কিন্তু তিনি অত্যল্পকাল অর্থাৎ সাড়ে তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। ইহাতে প্রতীতি হয় যে সেই কার্য্য সকল তদীয় যৌবরাজ্যকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মিথিলায় এইরূপ কিম্বদন্তীও আছে। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের রাজত্বকাল ৬১ বৎসর। সুতরাং রাজা হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে শিবসিংহ যুবরাজ ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বিস্ময়কর নহে। ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ভূমিদানপত্র পাইলেও রাজা শিবসিংহের রাজ্যাভিষেকের পরে বিদ্যাপতি যে জীবিত ছিলেন, পুরুষপরীক্ষার মঙ্গলাচরণ দৃষ্টে জানা যায়। আর বিদ্যাপতি ৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৩৭৯ শকাব্দে তালপত্রে শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন, এতদ্দারাও সেই কথারই প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতির মৃত্যু সম্বন্ধে মিথিলায় একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে। বিদ্যাপতি আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভগবতী ভাগীরথী ভক্তবৎসলা, এমন সময়ে আমার নিকটে তিনি আসিবেন না কেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তথায় উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভাগীরথী ত্রিধারা হইয়া তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া বিদ্যাপতি সানন্দে সেই খানেই শরীর ত্যাগ করিলেন। তাঁহার চিতা প্রদেশে একটী শিবলিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল। সেই শিবলিঙ্গ ও নদীচিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যে স্থান এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ, সে স্থান ভাগীরথীর উত্তর কূলস্থ বাজিতপুর নগরের উত্তরভাগে বাঢ় নামক নগর হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে অবস্থিত।

যে শিবসিংহের সভায় বিদ্যাপতি ছিলেন, সে শিবসিংহ নারায়ণ নামক সামান্য দ্বিজকুল সম্ভূত। তাঁহার পূর্ণনাম "রূপনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ শিবসিংহ।" তাঁহার পিতা মহারাজ দেবসিংহ, পিতামহ মহারাজ ভবেশ্বর, পিতৃব্য হরসিংহদেব। হরসিংহের চারিপুত্র, দর্পনারায়ণ পদাঙ্কিত মহারাজ নরসিংহ, জীবন নারায়ণ পদাঙ্কিত রত্নসিংহ, বিজয়নারায়ণ পদাঙ্কিত রঘুসিংহ, ও বীরনারায়ণ পদাঙ্কিত ভানুসিংহ। মহারাজ শিবসিংহের

তিনি মহষী ছিল, পদ্মাবতী দেবী, লখিমা দেবী ও বিশ্বাস দেবী; রাজার মৃত্যুর পরে ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথা আছে। অনন্তর নরসিংহদেব রাজা হন; তাঁহার পরে তৎপুত্র হৃদয়নারায়ণ পদাঙ্কিত ধীরসিংহ ও হরিনারায়ণ পদাঙ্কিত ভৈরব সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পর রূপনারায়ণের রাজত্ব। এই সকল বৃত্তান্ত মিথিলার পঞ্জীপ্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত; এবং এতদ্দ্বারা রূপনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ ও শিবসিংহ নামক বিদ্যাপতির তিনজন মিত্রের ও লখিমা দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। রূপনারায়ণ নামটী অনেক স্থলেই শিবসিংহের বিশেষণ; কিন্তু কোন কোন স্থলে ভিন্ন ব্যক্তির নাম বলিয়া বোধ হয়।

আমরা বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা পাই নাই। কিন্তু মিথিলায় আমরা উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। উহার উপসংহারে যে কয়েকটী শ্লোক আছে, বাঙ্গালা পুরুষপরীক্ষায় তাহার অনুবাদ নাই। এখানে সে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইল।—

ভুক্ত্বা রাজ্যসুখং বিজিত্য হরিতো হত্বা রিপূন্ সংগরে।
হুত্বা চৈব হুতাশনং মখবিধৌ ভৃত্বা ধনৈরর্থিনঃ॥
বাগ্মত্যাঃ ভবসিংহদেবনৃপতিস্ত্যক্ত্বা শিবাগ্রে বপুঃ।
পূতোযস্য পিতামহঃ স্বরগমদ্দারদ্বয়ালঙ্কৃতঃ॥
সংকুরীপুরসরোবরকর্ত্তা হেমহস্তিরথদানবিদগ্ধঃ।
ভাতি যস্য জনকোরণজেতা দেবসিংহনৃপতির্গুণরাশিঃ॥
যোগৌড়েশ্বরগর্জ্জনে খররণে ক্ষৌণীষু লব্ধ্বা যশঃ।
দিক্কান্তাচয়কুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্য দামাস্পদম্॥
তস্য শ্রীশিবসিংহনৃপতের্বিজ্ঞপ্রিয়স্যাজ্ঞয়া।
গ্রন্থং (অস্পষ্ট) নীতি বিষয়ে বিদ্যাপতির্ব্যাতনোৎ॥

অর্থাৎ

"রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া, দশদিক জয় করিয়া, যুদ্ধে রিপুদিগকে নিহত করিয়া, যজ্ঞবিধিমতে অগ্নিতে হোম করিয়া, ধনদ্বারা অর্থীদিগকে তুষ্ট করিয়া, যাঁহার পিতামহ ভবসিংহ দেব নৃপতি বাগ্মতী নদীতীরে মহাদেবের অগ্রে শরীর পরিত্যাগ করিয়া পূত ও দারদ্বয়ভূষিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সংকুরীপুরের সরোবরকর্ত্তা হেমহস্তিরথদানতৎপর রণজয়ী

গুণরাশি দেবসিংহ নৃপতি যাঁহার জনক ছিলেন; যিনি গৌড়পতির সহিত সংগ্রাম করিয়া যশোলাভদ্বারা দিক্‌কান্তাচয়ের কুন্তলে কুন্দদাম দিয়াছেন; সেই বিজ্ঞপ্রিয় শিবসিংহ নৃপতির আজ্ঞায় নীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিদ্যাপতি রচনা করিলেন।"

মৈথিল পদাবলী ও সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা ব্যতীত বিদ্যাপতির রচিত অনেকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ মিথিলায় প্রচলিত আছে; যথা "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী," "দানবাক্যাবলী," "বিবাদসার," "গয়াপত্তন," ইত্যাদি। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রারম্ভ এই প্রকার :—

"অভিবাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং বন্দিতো যঃ সুরৈরপি।
সর্ব্ববিঘ্নচ্ছিদে তস্মৈ গণাধিপতয়ে নমঃ॥ ১॥
ভক্ত্যানম্রসুরেন্দ্রমৌলিমুকুটপ্রাগ্‌ভারতারস্ফুরন্-
মাণিক্যদ্যুতিপুঞ্জরঞ্জিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দশ্রিয়ঃ।
দেব্যাস্তৎক্ষণদৈত্যদর্পদলনা সংবিৎপ্রহৃষ্টামর-
স্বারাজ্যপ্রতিভূতবিষ্ণুকরুণাগম্ভীরদৃক পাতু বঃ॥ ২॥
অস্তি শ্রীনরসিংহদেব মিথিলাভূমণ্ডলাখণ্ডলো
ভূভৃন্মৌলিকিরীটরত্ননিকরপ্রত্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি দ্বয়ঃ।
আপূর্ব্বাপরদক্ষিণোত্তরগিরিপ্রাপ্তার্থিবাঞ্ছাধিক-
স্বর্ণক্ষৌণিমণিপ্রদানবিজিতশ্রীকর্ণকল্পদ্রুমঃ॥ ৩॥
বিশ্বখ্যাতনয়স্তদীয়তনয়ঃ প্রৌঢ়প্রতাপোদয়ঃ
সংগ্রামাঙ্গনলব্ধবৈরিবিজয়ঃ কীর্ত্ত্যাপ্তলোকত্রয়ঃ।
মর্য্যাদানিলয়ঃ প্রকামনিলয়ঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষাশ্রয়ঃ
শ্রীমদ্ভূপতি ধীরসিংহ বিজয়ী রাজত্যমোঘক্রিয়ঃ॥ ৪॥
শৌর্য্যাবর্জ্জিতপঞ্চগৌড়ধরণীনাথোপনম্রীকৃতা-
নেকোত্তুঙ্গতুরঙ্গসঙ্গিতসিতচ্ছত্রাভিরামোদয়ঃ।
শ্রীমদ্ভৈরবসিংহদেবনৃপতির্যস্যানুজন্মাজয়-
ত্যাচন্দ্রার্কমখণ্ডকীর্ত্তিঃসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥ ৫॥
দেবীভক্তিপরায়ণঃ শ্রুতিমুখপ্রারব্ধপারায়ণঃ
সংগ্রামে রিপুরাজকংসদলনপ্রত্যক্ষনারায়ণঃ।
বিশ্বেষাং হিতকাম্যয়া নৃপবরোঽনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতিং স তনুতে দৃষ্ট্বা নিবন্ধস্থিতিম॥ ৬॥

এই কয়েকটী শ্লোক পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে রাজকুমার রূপনারায়ণের আদেশে বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রচনা করেন। ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও রূপনারায়ণ নামক নরসিংহ দেবের পুত্রত্রয় উক্ত গ্রন্থপ্রকাশের পূর্ব্বেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; রূপনারায়ণ কংস নামক কোন রাজাকে পরাজয় করেন; এবং ভৈরবসিংহ গৌড়ের রাজার সহিত যুদ্ধে জয়ী হন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শিবসিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাপতি তাঁহার নিকটে ভূমিদানপত্র প্রাপ্ত হন। দানপ্রাপ্তিকালে কবি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন হইবার সম্ভাবনা নহে। অতএব শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণ-কালে বিদ্যাপতির বয়স অন্যূন ৬৬ বৎসর, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী পাঠ করিয়া জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ দেবের রাজত্ব সময়েও কবি বর্ত্তমান ছিলেন। পঞ্জীপ্রবন্ধানুসারে মহারাজ শিবসিংহের রাজত্বকাল ৩।৷০ বৎসর; তৎপরে মহারাণী পদ্মাবতী ১৷৷০ বৎসর, লখিমাদেবী ৯ বৎসর ও বিশ্বাস দেবী ১২ বৎসর রাজত্ব করেন; তদনন্তর নরসিংহ দেব রাজা হন। সুতরাং নরসিংহ দেবের রাজত্বারম্ভ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স প্রায় ৯২ বৎসর হইবার কথা। অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কবি অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা সারা জীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেক দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। সে দিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি সতেজ ছিল।

পুরুষপরীক্ষা শিবসিংহের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৬৯ হইতে ১৩৭৩ শকাব্দ মধ্যে লিখিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী রাজা নরসিংহের সময় রচিত। নরসিংহ দেব ১৩৯৫ শকে সিংহাসনারোহণ করিয়া ৬ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। সুতরাং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ১৩৯৫ হইতে ১৪০১ শকাব্দ মধ্যে প্রকাশিত। কিন্তু গ্রন্থখানি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বমধ্যে দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকৃত্যমহার্ণবধৃতেন দেবীপুরাণেন পশুঘাত-বলিদানয়োঃ পৃথক্ ফলমভিহিতং। যথা,

দেবীং ধ্যাত্বা পূজয়িত্বা অর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীষু চ।
ঘাতয়ন্তি পশূন্ ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ॥
বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূতবিনাশনং।
তেষান্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পন্তু শাঙ্করং॥"

দুর্গোৎসবতত্ত্ব।

জ্যোতিস্তত্ত্বে "একাক্ষীন্দ্র শকাব্দকে" পদের প্রয়োগ দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, উক্ত তত্ত্ব ১৪২১ শকে লিখিত। দুর্গোৎসবতত্ত্ব যদিই বা পরবর্ত্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী যে অল্পকাল মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ হইতেছে।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য প্রায় শেষ হইল। তিনি যে মৈথিল কবি, তদ্বিষয়ের প্রমাণার্থে আমরা যাহা যাহা বলিয়াছি, এস্থলে তাহার সারসংগ্রহ করা যাইতেছে। (১) মৈথিল ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির অনেক গীত মিথিলায় প্রচলিত আছে, এবং ঐ সকল গীতের ভণিতায় রাজা শিবসিংহ, রূপনারায়ণ ও লখিমা দেবীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (২) মিথিলার পঞ্জীগ্রন্থে বিদ্যাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। (৩) রাজা শিবসিংহ মিথিলার রাজা ছিলেন ও লখিমা দেবী তাঁহার মহিষী ছিলেন, ইহা পঞ্জীগ্রন্থ ও জনপ্রবাদ দ্বারা নির্ণীত হয়। (৪) বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতা ও তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে মিথিলায় আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশে নাই। (৫) বিদ্যাপতি শিবসিংহ রাজার নিকটে বীসপী গ্রাম দান পাইয়াছিলেন; দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং উহার বলে কবির উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রাম ভোগ দখল করিয়া তথায় বাস করিতেছেন। (৬) বিদ্যাপতির হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবত অদ্যাপি তদ্বংশীয়দিগের নিকটে মিথিলায় দেখা যায়। (৭) রাজা শিবসিংহের ভ্রাতৃবংশীয়েরা হৃতরাজ্য হইয়া মিথিলায় আছেন। (৮) বিদ্যাপতি লিখিত পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী; ও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত পুস্তক মিথিলায় প্রচলিত দেখা যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। (৯) এই সকল পুস্তকে তাৎকালিক রাজাদিগের যেরূপ পরিচয় আছে, পঞ্জীগ্রন্থে মিথিলার রাজাদিগের সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। (১০) বিদ্যাপতিরচিত মৈথিল গীতের সহিত বঙ্গদেশে প্রচলিত তদীয় গীতের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; অঙ্গনাগণের স্নান বিষয়ক উদ্ধৃত গীতদ্বয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না। এ সকল

প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ বিদ্যাপতিকে মৈথিল কবি বলিতে না চাহেন, তাঁহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

কিন্তু বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালি বলা অন্যায় নহে। বল্লালসেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও মিথিলায় প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণসেন বিজয়ী বাঙ্গালি রাজা হইলেও, বাঙ্গালিরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু মৈথিল পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু রাজ্যস্মারক লক্ষ্মণ সংবৎ বল্লালের বাঙ্গালার যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গালার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালি বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইবে? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালি জয়দেবের নিকটে পাইয়াছিলেন এবং সে রস পরে চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতাকুসুম সাদরে বঙ্গকাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে।

মিথিলা অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যাচর্চ্চার একটী প্রধান স্থান। এখানেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া রাজর্ষি জনকের নিকটে উপস্থিত হন। এখানেই ন্যায়মতপ্রবর্ত্তক গৌতমের আশ্রম ছিল। এখানেই সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক টীকাকার পক্ষিলস্বামী প্রাদুর্ভূত হন। এখান হইতেই ন্যায় শিক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে চৌপাঠী সংস্থাপন করেন, এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতিভা প্রদীপ্ত করেন; আর এখানে আসিয়া পক্ষধর মিশ্রকে পরাভূত করিয়া শারদচন্দ্রিকাবিনিন্দিত নির্ম্মলবুদ্ধি শিরোমণি ন্যায়বিষয়ে নবদ্বীপকে ভারতশিরোমণি করেন। সুতরাং কেবল বিদ্যাপতির সরস কবিতা নহে, আরও অনেক কারণে বাঙ্গালা মিথিলার নিকটে ঋণী।

উপসংহারকালে আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান মৈথিল রাজবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত বাবু বংশীধারী সিংহ মহাশয়ের নিকটে বিদ্যাপতির জীবনচরিত সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির বিষয়ে অনেক কথা জানা দুঃসাধ্য হইত।

দেবতত্ত্ব। *

——:০:——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সচরাচর আমাদিগের চতুঃপার্শ্বে যে সকল সামান্য সামান্য ঘটনা ঘটিতেছে, অনুসন্ধান করিলে তাহাদিগের মধ্যে অনেক গূঢ় তত্ত্ব পাওয়া যায়। আমরা সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি, মানব শিশু হাসিতে হাসিতে খেলিতে খেলিতে আনন্দে দৌড়িতেছে; সহসা কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালে বাধিয়া পড়িয়া গেল; কোমল অঙ্গে ব্যথা পাইল; অমনি উঠিয়া উক্ত কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়ালকে মারিতে লাগিল। মারিতে দেখিয়া আমরা হাসি। হাসি কেন? আমরা জানি যে কপাট, কাষ্ঠাসন বা দেওয়াল অচেতন, শিশু উহাকে সচেতন জ্ঞান করিতেছে, শিশু ভাবিতেছে যে মারিলে উহার গাত্রে বেদনা লাগিবে। কিন্তু আমরা যত বড় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হই না কেন, আমাদিগের হাসিবার কারণ অতি অল্পই আছে। আমরাও এককালে ঐ শিশুর সদৃশ ছিলাম। জ্ঞানোন্নতিসহকারে শিশুর ভ্রম দূর হইবে; সে জানিতে পারিবে যে কপাট, কাষ্ঠাসন, দেওয়াল প্রভৃতি জড় পদার্থ, সচেতন নহে। কিন্তু প্রথমতঃ এই সকল বস্তুকে সচেতন জ্ঞান করাই শিশুর স্বভাবসিদ্ধ। আমরা যাহা কিছু জানি, তাহার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অপর পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে অগ্রসর হই। শিশুও এইরূপ করিয়া থাকে। আদৌ যে পদার্থের কারণত্ব তাহার জ্ঞানগোচর হয় সেটী তাহার সচেতন আত্মা; বিশ্বপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াই সে আপনাকে কতকগুলি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বুঝিতে পারে এবং জানিতে পায় যে সে নিজে ইচ্ছা ও চেতনাবিশিষ্ট। সুতরাং যেখানে কোন কার্য্য দেখে, সেখানেই সচেতন ও ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা কল্পনা করে। ইহাতে তাহার ভ্রম হয় বটে। কিন্তু অনুমানের অন্য পথ অবলম্বন করিবার শক্তি তাহার নাই। যখন তাহার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইবে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে, তখন সে বুঝিতে পারিবে যে

---

* বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড, ৬ সংখ্যা, আশ্বিন ১২৮১।

প্রথমে যে সকল নির্জ্জীব পদার্থকে সচেতন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে, ইচ্ছা এবং চেতনার প্রধান লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই; সুতরাং তখন তাহার ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইবে।

জ্ঞানসম্বন্ধে আদিম কালের মানবগণ এখনকার শিশুদিগের ন্যায় ছিলেন। আমরা যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা জগৎকার্য্যের ব্যাখ্যা করি, তাঁহারা সে সকল কিছুই জানিতেন না। এ বিশ্ব তাঁহাদিগের নিকটে অসম্ভবঘটনাবলীপূর্ণ বোধ হইত। আপনাদিগের কর্তৃত্বসাদৃশ্যে জগৎকার্য্যের কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্রই সচেতন এবং ইচ্ছাবিশিষ্ট অধিষ্ঠাতা অনুমান করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন যে বায়ুর প্রভাবে কখন বা লতাপল্লব মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে, কখন বা মহদা-কার মহীরুহ ভঙ্গ বা সমূলে উন্মূলিত হইতেছে; দেখিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে বায়ু সচেতন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই সকল কার্য্য করিতেছেন। সূর্য্য কখন অন্ধকার বিনষ্ট এবং জগৎ আলোকিত করিতেছেন; কখন বা প্রখর উত্তাপদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল দগ্ধ করিতেছেন; দেখিয়া তাঁহারা ভাবি-তেন যে সূর্য্যও চেতনাবিশিষ্ট এবং কখন প্রসন্ন, কখন অপ্রসন্ন হন বলিয়া ইচ্ছাক্রমেই এরূপ করেন। অগ্নি কখন শীতার্ত্তের ক্লেশমোচন করি-তেছেন, কখন আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছেন, কখন তিমির হরণ পূর্ব্বক নিশাকালে পদার্থ প্রকাশ ও ভয় নিবারণ করিতেছেন, কখন বা ভীমমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক কাননরাজী বা গৃহাবলী ভস্মসাৎ করিতেছেন; দেখিয়া তাঁহারা কল্পনা করিতেন যে অগ্নি সচেতন এবং কখন তুষ্ট কখন রুষ্ট হন বলিয়া এই সকল কার্য্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন। এইরূপে পূর্ব্বকালে প্রাকৃতিক ঘটনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অতিমানুষিক সচেতন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে কোন কোনটী মনুষ্যের মঙ্গলকর, কোন কোনটী অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রথমোক্তদিগকে দেব, এবং শেষোক্তদিগকে অসুর বা দৈত্য বলিতেন। তাঁহাদিগের লিখনভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হয় যে তাৎকালিক অজ্ঞানাবস্থায় দেখিয়া শুনিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষে আলোক যেরূপ উপকারী বোধ হইত, সেরূপ আর কিছুই হইত না; এ নিমিত্ত তাঁহারা প্রভাশালী সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির স্তুতিবাদ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। এই কারণেই আবার, যে মেঘ দিনমণি ও নিশামণিকে আবৃত করিয়া জগৎপ্রকাশক

জ্যোতিঃ হরণ করিত, যে রাত্রি পৃথিবীমণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন করিত, এবং যে রাহু করাল কবল ব্যাদান পূর্ব্বক প্রভাকর ও সুধাকরকে গ্রাস করিত তাহাদিগের প্রতি তাঁহারা ক্রোধ বা ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা যে কেবল প্রলাপ বাক্য বলিতেছি না, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। দেবগণ প্রাচীনদিগের আরাধ্য, এবং দীপ্ত্যর্থবোধক দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দের উৎপত্তি। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান শত্রু বৃত্র, এবং বৃত্র শব্দের অর্থ মেঘ। (১) অসুরেরা দেববিরোধী এবং রাত্রির একটী নাম অসুরা। (২) রাহু, গ্রহণের কারণ এবং একজন প্রবল দৈত্য।

ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা জানা যায় যে মধ্য এসিয়ার আদিম বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই আর্য্যজাতির মধ্যে দেবোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত দেবস্, (৩) লাটিন দেউস্ (Deus), গ্রীক্ থেওস (Theos), ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পারসিক ভাষায় দেউ শব্দে দৈত্য এবং অহুর শব্দে দেবতা বুঝায়। যে কারণে, সংস্কৃত সপ্তাহ পারসীতে হপ্তা, সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু পারসীতে হপ্তহেন্দু হইয়াছে, সেই কারণেই সংস্কৃত অসুর পারসীতে অহুর হইয়াছে। অসুর প্রাচীন পারসিকদিগের উপাস্য, এবং দেব ঘৃণ্য; ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইয়া হিন্দু এবং পারসিকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

যে যে নৈসর্গিক ঘটনা লইয়া যে যে দেবতা কল্পিত, সেই সেই নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া সেই সেই দেবতাকে পুরাতন ঋষিগণ কত আখ্যা দিয়াছিলেন। এই আখ্যাগুলি অনেক সময়ে প্রকৃততত্ত্বসমুদ্ভবা কবিকল্পনার সৃষ্টি। কালক্রমে তাহাদিগের মূল ভুলিয়া গিয়া লোকে যখন তাহাদিগের ব্যাখ্যা চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন দেবতত্ত্বসংক্রান্ত নানাবিধ উপাখ্যানের উৎপত্তি হইল। ভট্টমোক্ষমূলর বলেন, "যে সকল লোকে সুবর্ণবর্ণ সৌরকররাজীকে তরুপল্লবের সহিত যেন খেলিতে দেখিয়াছে, এই সকল প্রসারিত করদিগকে হস্ত বা বাহু বলিয়া বর্ণনা করা সে সকল লোকের অতি স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে

---

(১) (২) তারানাথ কৃত শব্দস্তোমমহানিধি দেখ।

(৩) দেব শব্দের প্রথমার একবচন, দেবঃ বা দেবস্।

বেদে সূর্য্যের অন্যতর নাম সবিতা 'হিরণ্যপাণি' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কে ভাবিতে পারিত যে এমন একটী সরল উপমা ঔপাখ্যানিক ভ্রমের কারণ হইবে? কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে বেদের টীকাকারগণ সূর্য্যের হিরণ্যপাণি নামে তদীয় রশ্মির সুবর্ণ কান্তি না বুঝিয়া তদুপাসকদিগের উপর বর্ষণ করিবার নিমিত্ত তদীয় হস্তে স্বর্ণ আছে, ইহাই বুঝিয়াছিলেন। পুরাতন স্বাভাবিক আখ্যা হইতে এক প্রকার উপদেশ গৃহীত হইয়াছে, এবং লোকে এই বলিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছে যে তদীয় যাজকদিগকে দিবার জন্য তাঁহার হস্তে স্বর্ণ আছে। ......তিনি যে কেবল উপদেশে পরিণত হইয়াছেন এমন নহে; তিনি একটী উত্তম উপাখ্যানের বিষয়ও হইয়াছেন। হিরণ্যপাণি সূর্য্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে লোকে অশক্ত হউক বা অনিচ্ছুক থাকুক, ইহা নিশ্চিত যে দেবতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুরাতন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে সে যজ্ঞে সূর্য্য আপনার হস্ত কাটিয়া ফেলেন এবং যাজকেরা তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে সুবর্ণহস্ত প্রদান করেন। উত্তরকালে সূর্য্য সবিতা নামে আপনি যাজক হইয়াছেন; এবং কিরূপে যজ্ঞবিশেষে স্বহস্ত কাটিয়া ফেলেন, আর কিরূপে অপর যাজকেরা তজ্জন্য স্বর্ণহস্ত নির্ম্মাণ করেন, তদ্বিষয়ক একটী উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।"*

---

* "It was, for instance, a very natural idea for people who watched the golden beams of the sun playing as it were which the foliage of trees, to speak of these outstretched rays as hands or arms. Thus we see that in the Veda, *Savitar* one of the names of the sun, is called *golden-handed* (হিরণ্যপাণি). Who would have thought that such a simple metaphor could ever have caused any mythological misunderstanding? Nevertheless we find that the commentators of Veda see in the name *golden-handed* as applied to the sun, not the golden splendour of his rays, but the gold which is carries in his hands, and which he is ready to shower on his pious worshippers. A Kind of moral is drawn from the old natural epithet and people are encouraged to worship the Sun because he has gold in his hands to bestow on his priests......He was not only turned into a lesson, but he also grew into a respectable myth. Whether people failed to see the natural meaning of the golden-handed Sun, or whether thy would not see it, certain it is that the early theological treatises of the Brahmans tell of the Sun as having cut his hand at a sacrifice, and the priests having replaced it by an artificial hand made of gold. Nay, in later

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অনেক দেবতাই সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানকালে এই মন্ত্রটী উচ্চারিত হয়।

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে,
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।*

অর্থাৎ

"ব্রহ্মপ্রভাযুক্ত বিষ্ণুতেজোময় জগৎপ্রসবিতা শুচি কর্ম্মফলদায়ী সবিতা বিবস্বৎকে নমস্কার।" ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়েই সূর্য্যের নামভেদ মাত্র। যখন আমরা সূর্য্যোদয়কালকে ব্রহ্মমুহূর্ত্ত বলি, এবং ব্রহ্মাকে রক্তবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করি, তখন কি মনে হয় না যে উদয়কালীন সূর্য্যকে প্রথমে ব্রহ্মা বলিত? আর ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইবেন, তাহাও আশ্চর্য্য নহে। সূর্য্যোদয়ে তিমিরাচ্ছন্ন জগতের প্রকাশ এবং নিদ্রিত জীবের জাগরণরূপ পুনর্জ্জীবন হয়। নিশাবসানে প্রভাকরদর্শনে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনে যে গভীর ভাব ও আনন্দের উৎপত্তি হইত, তাহা আমাদিগের বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। আমাদিগের ন্যায় তাঁহারা সবিতার উদয়াস্তের কারণ জানিতেন না; কিন্তু তৎসঙ্গে আপন আপন সুখ দুঃখের অনেক যোগ দেখিতে পাইতেন। দুর্দ্দান্ত নিশাচরদিগকে তাড়াইয়া, অন্ধকার বিনাশ করিয়া, কুজ্ঝটিকা নিবারণ করিতে করিতে, যখন দিনমণি পূর্ব্বদিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া উদিত হইতেন, তাঁহার রশ্মির মৃত্যুসঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে যেন বিশ্বসংসার পুনর্জ্জীবিত হইত। মধুময়ী উষা তাঁহার আগমন সংবাদ দিত, সুগন্ধ গন্ধবহ তাঁহার অভিনন্দন করিত, কলকণ্ঠ বিহঙ্গগণ তাঁহার আগমনী গাইত, নব নব কুসুমে এবং নিহারমুক্তাফলে সুসজ্জিত হইয়া ধরণী নূতন সৌন্দর্য্য ধারণ করিত, এবং চতুর্দ্দিকে প্রফুল্ল জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া নিঃশব্দে বা উচ্চ নিনাদে ঈদৃশ সুখপ্রদ দেবের মহিমা প্রচার করিত। যখন মেঘ আসিয়া দিবাপতির প্রভা আবরণ করিত, অবনী-সুন্দরী যেন দুঃখে ম্লানমুর্ত্তি হইতেন। প্রাচীন আর্য্যকবি এই দুঃখে দুঃখিত হইতেন; তাঁহার

---

times the Sun, under the name of Savitar, becomes himself a priest, and a legend is told how at a sacrifice he cut off his hand, and how the other priests made a golden hand for him."

Max Muller's Lectures on the Science of Language.
2nd Series Pages 377-39,

আননও বিবর্ণ হইত। কিন্তু যখন দিননাথ নীরদনাগপাশ ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইতেন। উল্লাসে কবি বিজয়সঙ্গীত গাইতেন। যখন হীনপ্রভ রবি পশ্চিমে ডুবিতেন, আর্য্য ঋষির অন্তঃকরণের শক্তিও ডুবিত এবং স্বনিবাসে গমন পূর্ব্বক এই ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেন যে পুনরায় আপনি অথবা সূর্য্য উঠিবেন কি না সন্দেহ। তৎকালে প্রভাকরের গতি বা পরিণাম সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন কথাই কহেন নাই; সুতরাং কল্পনার বিচিত্র সৃষ্টির বিস্তীর্ণ স্থান ছিল। আলোক এবং অন্ধকার, দিবা এবং রাত্রি, সূর্য্য এবং মেঘ, ইহাদিগের পরস্পর যুদ্ধ মঙ্গলশক্তি ও অমঙ্গলশক্তির যুদ্ধের ন্যায় প্রাচীনকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের চক্ষে লাগিত। তাঁহারা অতিশয় উৎসাহসহকারে এই সৌর নাটকের অভিনয় সন্দর্শন করিতেন; এবং কখন বা ভক্তিতে, কখন যুক্তিতে, কখন বা কবিত্বে, পরিপূর্ণ বাক্যে আপনাদিগের উচ্ছ্বসিত অন্তঃকরণের ভাব প্রকাশ করিতেন। দূরপ্রতিধ্বনিবৎ সেই অপুনরাগম্য কালের কোন কোন বাক্য বেদে শ্রুত হয়; এবং তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশে অনেক দেবতার প্রকৃতি নির্ণীত হয়।

আমরা বলিয়াছি যে সূর্য্যই ব্রহ্মা। এটী নূতন কথা নহে। সুবিখ্যাত কুমারিল্ল ভট্ট যখন বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই কথা বলিয়াছিলেন। কথিত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মা তদীয় কন্যা উষাতে উপগত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে এই আপত্তি করিলে কুমারিল্ল ভট্ট বলিয়াছিলেন,

"প্রজাপতিস্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাদাদিত্য এবোচ্যতে। স চারুণোদয়বেলায়ামুষস্যুদন্নভ্যেতি সা তদাগমনাদেবোপজায়ত ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে। তস্যাং চারুণকিরণাখ্যবীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগবদুপচারঃ।" অর্থাৎ

প্রজাপালন করেন বলিয়া সূর্য্যকে প্রজাপতি বলে। অরুণোদয় সময়ে তাঁহার আগমনে উষার উৎপত্তি, এজন্য উষাকে তাঁহার দুহিতা বলে। উষার সহিত তাঁহার তেজঃসংযোগ ঘটে, এজন্য উভয়কে স্ত্রীপুরুষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।"

বিষ্ণু যে সূর্য্য, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

"ইদম্ বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।"

অর্থাৎ

"বিষ্ণু ইহা পরিক্রম করিয়াছিলেন। তিন স্থলে তিনি পদস্থাপন করিয়াছিলেন।" নিরুক্তকার যাস্ক ইহার পশ্চাদুদ্ধৃত অর্থ লিখিয়াছেন :—

"যদ্ ইদম্ কিঞ্চ তদ্ বিক্রমতে বিষ্ণুঃ।
ত্রিধা নিধত্তে পদং।
'ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দিবি'
ইতি শাকপূণিঃ।
'সমারোহণে বিষ্ণুপাদে গয়াশিরসি'
ইত্যৌর্ণবাভঃ।"

অর্থাৎ

"যাহা কিছু আছে, বিষ্ণু পরিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পদ তিনি ত্রিধা স্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ শাকপূণির মতে পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে এবং আকাশে; ঔর্ণবাভের মতে সমারোহণে, বিষ্ণুপাদে এবং গয়াশিরে।"

দুর্গাচার্য্য নিরুক্তের টীকায় এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথং ইতি যত আহ 'ত্রেধা নিদধে পদম্,' নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ। পৃথিব্যামন্তরীক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ। পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা পৃথিব্যাম্ যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরীক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা। সমারোহণে, উদয়গিরাবুদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপাদে, মধ্যন্দিনেঽন্তরীক্ষে। গয়াশিরসি, অস্তংগিরাবিত্যৌর্ণবাভ আচার্য্যোমন্যতে।"

অর্থাৎ

"বিষ্ণু আদিত্য। কেন? কারণ, উক্ত হইয়াছে যে তিন স্থলে তিনি পদ স্থাপন করেন। কোথায় এরূপ করেন? শাকপূণির মতে, পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, এবং আকাশে। অগ্নিরূপে পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহাতে পরিক্রম, তাহাতে অধিষ্ঠান করেন। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে। আকাশে সূর্য্যরূপে।......ঔর্ণবাভ আচার্য্যের মতে তিনি একপাদ উদয়কালে সমারোহণে অর্থাৎ উদয়গিরিতে স্থাপন করেন; একপাদ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুপাদে বা অন্তরীক্ষে; একপাদ গয়াশিরে অর্থাৎ অস্তগিরিতে।"

গয়াশির শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া, বিষ্ণু গয়াশিরে একপাদ স্থাপন করিয়াছিলেন ঔর্ণনাভ ঋষির এই কথা লইয়া লোকে যে গয়াসুরের গল্প রচনা করিয়াছে এবং সুবিধাক্রমে গয়ানামক একটী স্থান থাকায় এই উপলক্ষে তাহার মাহাত্ম্য জন্মিয়াছে, ইহা বোধ হয় পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। কোন একটী আখ্যার প্রকৃত অর্থভেদ করিতে না পারিয়া, কল্পনা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই, অধিকাংশ দেবঘটিত উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, অনুসন্ধান করিলে পদে পদেই এই সত্যটী লক্ষিত হইবে।

কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু নহে, রুদ্রও সূর্য্য। এবিষয়ে আমাদিগের অধিক কথা কহিবার প্রয়োজন নাই। প্রচলিত "রৌদ্র" শব্দই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। যখন সূর্য্যকিরণকে আমরা "রৌদ্র" বলিতেছি, তখন পূর্ব্বকালে যে সূর্য্যকে রুদ্র বলিত তাহার সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্রই দেবতাদিগের মধ্যে প্রধান, কিন্তু বৈদিক সময়ে অপর তিনটী প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানোবায়ুর্বা ইন্দ্রোবান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ। তাসাম্ মহাভাগ্যাদেকৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপিবা কর্ম্মপৃথকৃত্বাদ্ যথা হোতাঽধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।"

অর্থাৎ,

"নিরুক্তকারদিগের মতে দেবতা তিনটী; অগ্নি, পৃথিবী যাহার স্থান; বায়ু বা ইন্দ্র, অন্তরীক্ষ যাহার স্থান; এবং সূর্য্য, আকাশ যাহার স্থান। তাঁহাদিগের মহিমা প্রকাশার্থে তাঁহাদিগকে বহু নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে; অথবা তাঁহাদিগের কার্য্যভেদপ্রদর্শনার্থে, যথা একই ব্যক্তি কার্য্যভেদে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়।"

আমরা দেখাইয়াছি যে ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনটীই সূর্য্যের নামান্তর। এক্ষণে আমরা ইন্দ্রের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব; কারণ তিনি অদ্যাপি নামে দেবাধিপতি, এবং বৈদিক কালে অতি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শব্দস্তোমমহানিধিতে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ঐশ্বর্য্যার্থ-বোধক ইদি ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, এবং উহার যে সকল অর্থ লিখিয়াছেন তন্মধ্যে দ্বাদশ অর্কের অন্তর্গত একটি অর্ক আছে।

কুমারিল্ল ভট্টের মতেও ইন্দ্র সূর্য্য। ইন্দ্র অহল্যার সতীত্ব হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝাইতে গিয়া কুমারিল্ল লিখিয়াছেন,

"সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোদিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

অর্থাৎ

"তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহনি অর্থাৎ দিনে লয় হয় বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতাকে অহল্যাজার বলে, ব্যভিচার জন্য নয়।"

এই উপাখ্যান সম্বন্ধে আরও দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে অহল্যা গোতমের স্ত্রী ছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় যে গোতম শব্দের অর্থ চন্দ্র, গো (রশ্মি) এবং তম্ (বাঞ্ছা করা) হইতে ইহার উৎপত্তি; কেন না চন্দ্র যে সূর্য্যের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হন ইহা এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ জানিতেন, যথা,

"পিতুঃপ্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ
শুভৈঃ শরীরাবয়বৈর্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতে-
রনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ॥"

রঘুবংশ।

অর্থাৎ,

"সমগ্রসম্পদ্সম্পন্ন পিতার প্রযত্নে তাঁহার সুন্দর শরীরাবয়ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, যেমন সূর্য্যরশ্মির অনুপ্রবেশে বালচন্দ্রমা বৃদ্ধি পায়।"

অথবা এমনও হইতে পারে যে বাস্তবিক গোতম নামে একজন ঋষি ছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম অহল্যা ছিল। পরে লোকে এই অহল্যার সহিত সূর্য্যহৃতা অহল্যার একতা অনুমান করিয়া গোতম মুনির স্ত্রীকে ইন্দ্র হরণ করেন এই গল্পটী সৃষ্টি করিয়াছেন।

বোধ হয়, এক অহল্যাকে অপর অহল্যা ভাবিয়া এই উপাখ্যানের আর একটী অংশ কল্পিত হইয়াছে। কথিত আছে যে পতির অভিসম্পাতে অহল্যা

পাষাণ হইয়াছিলেন ; বহুকালান্তে রাম সীতাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তারানাথ বলেন যে কর্ষণার্থ বোধক হল্ ধাতু হইতে অহল্যা শব্দের উৎপত্তি ; সুতরাং এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অহল্যা শব্দের অর্থ "যাহা কর্ষণযোগ্য নহে অর্থাৎ প্রস্তরময় ভূমি।" এই অহল্যার সহিত সূর্য্যহৃতা অহল্যার একতা ভাবিলে অহল্যার পাষাণ হইবার কথা সৃষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য নহে। রাম সীতাকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে অহল্যাকে মুক্ত করিলেন ইহারও গূঢ় অর্থ আছে। রাম শব্দের অর্থ আরাম বা সুখস্বচ্ছন্দ ; সীতা কৃষ্টভূমি ; অহল্যা অকৃষ্য ভূমি। সুতরাং ভাবার্থ এই হইতেছে যে, অকৃষ্য ভূমি মুক্ত করিয়া কৃষিকার্য্য করিলে মনুষ্য সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সীতার জন্ম বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহাতেও আমাদিগের কথারই প্রতিপোষকতা হয়। সীতা পৃথিবীর কন্যা, অযোনিসম্ভবা, ভূমিকর্ষণকালে লাঙ্গলের ফালে উঠিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইন্দ্রের দুইটী নামের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। তিনি না কি প্রথমে গোতমের শাপে সহস্রযোনি, পরে সেই মুনির প্রসাদে সহস্রাক্ষ হইয়াছিলেন। আমাদিগের বোধ হয় ইন্দ্রকে সহস্রযোনি বলিবার অর্থ এই যে, তিনি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। তিনি কখন সূর্য্য, কখন বায়ু, কখন বিষ্ণু, কখন বৃত্রহন্, ইত্যাদি ; কেন না কার্য্য বা মাহাত্ম্যভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। সহস্রাক্ষ বলিতে সূর্য্যের সহস্রদিক্‌প্রকাশক কিরণমালা ; নতুবা অন্তরীক্ষপতি বলিয়া ইন্দ্রকে আকাশের সহিত এক জ্ঞান করিয়া আকাশের অসংখ্য তারকানিচয়কে তাঁহার চক্ষু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

মেঘের নাম বৃত্র ; সেই বৃত্রের সহিত বেদে ইন্দ্রের অর্থাৎ সূর্য্যের ক্রমাগত যুদ্ধ। এই ঘটনা এবং দিবারাত্রির বিরোধ অবলম্বন করিয়াই বৃত্রাসুরের উপাখ্যান এবং দেবাসুরের সমর সৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কখন কখন আমরা দেবতাদিগের পরাজয় দেখিতে পাই। মেঘ অথবা রাত্রি যেমন দিনমণিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, দৈত্যগণও তেমনই দেবগণকে সময়ে সময়ে পরাভূত করে। দিনমণি যেমন তৎকালে মহিমাবিচ্যুত হইয়া কোথায় প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন, তেমনই দৈত্যযুদ্ধে বিগতগৌরব দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় লুক্কায়িত থাকেন। সময়ে সময়ে যেমন মেঘদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য মুক্ত হইবেন আশা জন্মে, তেমনই মধ্যে মধ্যে দৈত্যদল ছত্রভঙ্গ

হইয়া পলায়ন করে এবং দেবতাদিগের জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। সহসা আবার যেমন নূতন মেঘ আসিয়া দিবাকরকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনই আবার নূতন দৈত্যসেনা সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া বিজয়প্রত্যাশী দেবতাদিগকে অভিভূত করে। কিন্তু মেঘের যত কেন প্রতাপ হউক না, মেঘ অশ্ব, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি যে কোন ভয়ানক মূর্ত্তি ধরুক না, পরিশেষে সূর্য্যের যেরূপ নিশ্চিত জয়লাভ হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণ যত কেন প্রবল হউক না, তাহারা মায়াবলে যত কেন ভীষণাকার ধারণ করুক না, অবশেষে প্রভাশালী অমর নির্জ্জর দেবগণের জয়লাভ হইবেই হইবে।

দিনে সূর্য্যের আলোক আমাদিগের সহায়; রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোক। চন্দ্রসংক্রান্ত দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এবার এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

দীপ্ত্যর্থবোধক চদ্ ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দের উৎপত্তি। সুধাময়ী জ্যোৎস্না বিতরণ করিয়া নিশাসময়ে হিংস্রজন্তু ও শত্রুগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ চন্দ্র দেখাইয়া দিতেন। কেন তাঁহাকে দেবতা বলিয়া আদিকালের লোকে পূজা না করিবে? দিবাভাগে জ্বলিয়া পুড়িয়া যামিনীতে চন্দ্রালোকে বসিলে কাহার মন না প্রফুল্ল হয়, এবং কাহার চিত্তে না ভক্তি ও প্রীতি উচ্ছলিত হইয়া পড়ে? কিন্তু চন্দ্র যদিও উপাস্য দেবতা, তাঁহার অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন কেন, এই বিষয়ের চিন্তা প্রাচীন কবিদিগের মনে উঠিতে লাগিল। কেহ চিহ্নের আকার দেখিয়া কল্পনা বলে তাঁহাকে শশাঙ্ক, কেহ বা মৃগাঙ্ক বলিলেন। অমনি কেহ অনুমান করিলেন যে বাস্তবিক তাঁহার কোলে একটী মৃগশিশু বা শশশিশু আছে। কেহ বা আরও সূক্ষ্ম টানিয়া স্থির করিলেন যে, চন্দ্র মৃগ চুরি করিয়া কলঙ্কিত হইয়াছেন। অন্য একদল এই কলঙ্কের অপর কারণ কল্পনা করিলেন। ইঁহারা বলিলেন যে দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করিয়া চন্দ্র কলঙ্কিত হইয়াছেন। এ কথার মূল আমাদিগের যেরূপ বোধ হয় নিম্নে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতিগ্রহ দেবগুরু অর্থাৎ দীপ্তিতে শ্রেষ্ঠ; এই কারণেই তারকাসভামাঝে তাঁহার শোভাসন্দর্শন করিয়া বোধ হয় কোন কবি তাঁহাকে তারাপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। চন্দ্র যেরূপে তারকামণ্ডলীতে বিরাজ করেন, তাহা দেখিয়া আর কোন কবি তাঁহাকে তারাপতি বলিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৃহস্পতি ও চন্দ্র উভয়ের তারাপতিত্বের

সামঞ্জস্য করিতে গিয়া একটী বিকৃত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। দেবগুরু বলিয়া বৃহস্পতির স্কন্ধে না চাপিয়া, দোষটী চন্দ্রের স্কন্ধেই চাপিয়াছে; এবং বিচার-কালে চন্দ্রের কলঙ্কও তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। কে না জানে যে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির দোষ সহসা বিশ্বাস্য হয় না, বিশেষতঃ যদি তাঁহার বিপক্ষ দাগী লোক হয়?

যে শাস্ত্রকারেরা পরদারাকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে অশ্লীল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। পুরাতন আখ্যার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিবার দোষে যে প্রকারে কালক্রমে উক্তবিধ উপাখ্যান সকলের উৎপত্তি হয়, শব্দবিজ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইল। যাহারা এই বিষয়ে অধিক সমালোচনা করিবেন, তাঁহারা পৌরাণিক উপাখ্যানাদির যথার্থ অর্থ অবগত হইয়া নূতন আনন্দ অনুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।*

জগতে সজীব নির্জ্জীব দুইপ্রকার পদার্থ আছে। সুতরাং বিশ্বকারণ সম্বন্ধে কোনরূপ কল্পনা করিতে হইলে, হয় জড়জগৎ নতুবা প্রাণীমণ্ডলী এ দুয়ের মধ্যে একটিকে অবলম্বনভূমি করিতে হয়। জড়জগতের তিমিরহারী আলোক-প্রকাশে এবং প্রাণীমণ্ডলীর জীবোৎপত্তিব্যাপারে যেরূপ সৃষ্টির ভাব লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এ নিমিত্ত এই দুইটী ঘটনা লইয়াই প্রাচীন কালে যথাক্রমে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুই প্রকার উপাসনাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বেদ, পারস্যের আবেস্তা, এবং গ্রীসের

---

*বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮২।

ইলিয়ড্ ও ওডিসি পাঠ করিয়া জানা যায় যে প্রাচীন আর্য্যেরা দেবোপাসক ছিলেন; এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে কাল্ডীয়, আসিরীয়, মৈসরীয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি অনার্য্যজাতিদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পার্থিব অগ্নি, অন্তরীক্ষবিহারী অশনিধারী ইন্দ্র বা বায়ু, এবং আকাশবাসী দিবাকর, বৈদিক সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন; এবং অন্য সকল দেবতা তাঁহাদিগেরই রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু কালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সৌর প্রকৃতিসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এবার শিবের বিষয়ে কয়েকটী কথা বিশেষ করিয়া বলিতে চাই।

বেদে শিব নামে কোন দেবতা দেখা যায় না; কিন্তু মঙ্গলকর অর্থে শিবশব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। যখন শিবের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হয়, যখন তিনি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন তাঁহাকে রুদ্র বলে। বেদের অনেক স্থলে রুদ্রের উল্লেখ আছে। সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় রুদ্রের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নাই। তিনি কখন সূর্য্যরূপী, হেমবর্ণ, রথারূঢ়, ও ধনুঃশরধারী; কখন বায়ুভাবাপন্ন, মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশায়ী; কখন অগ্নিমূর্ত্তি, কপর্দ্দী, নীলকণ্ঠ, সিতিকণ্ঠ, সহস্রাক্ষ, বিলোহিত, হিরণ্যপাণি ইত্যাদি। বোধ হয় যেখানে উগ্রতা, প্রচণ্ডতা বা ক্রোধ দৃষ্ট হইত, সেখানে আদৌ রুদ্র শব্দ প্রযুক্ত হইত। বায়ু ও অগ্নির কোপ সচরাচর লক্ষিত হয়। সুতরাং বায়ু ও অগ্নি হইতেই রুদ্রের অনেক নাম উৎপন্ন হইয়াছে। প্রচণ্ড ঝটিকায় সহস্র সহস্র গৃহ বৃক্ষ প্রভৃতি সহসা বিনষ্ট হয়, এবং পর্ব্বতশিখরেই প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ বিশেষরূপে অনুভূত হয়; সুতরাং রুদ্র যে মরুৎকুলের পিতা ও গিরিশ বলিয়া উক্ত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা অগ্নিশিখার আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন যে কপর্দ্দী অর্থাৎ জটাধারী, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নাম কিরূপ সুসঙ্গত। রুদ্রের অষ্টমূর্ত্তি। এই অষ্টমূর্ত্তি সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"অভূদ্বেয়ম্ প্রতিষ্ঠেতি। তদ্ভূমিরভবৎ। তামপ্রথয়ৎ সা পৃথিব্যভবৎ। তস্যামস্যাম্ প্রতিষ্ঠায়াম্ ভূতানি ভূতানাঞ্চ পতিঃ সংবৎসরায়াদিক্ষন্ত।

ভূতনাম্ পতির্গৃহপতিরাসীদুষাঃ পত্নী। তদ্যানি তানি ভূতানি ঋতবস্তে। অথ যঃ স ভূতানাম্ পতি সম্বৎসরঃ সঃ। অথ যা সা উষা পত্নী ঔষসী সা। তানি ইমানি ভূতানি চ ভূতানাঞ্চ পতিঃ সম্বৎসর উষসি রেতোঽসিঞ্চন্। স সম্বৎসরে কুমারোঽজায়ত। সোঽরোদীৎ। তম্ প্রজাপতিরব্রবীৎ 'কুমার কিং রোদিসি যচ্ছ্রমাৎ তপসোঽধিজাতেঽসীতি।' সোঽব্রবীৎ 'অনপহতপাপ্মা বাস্মি অহিতনামা নাম মে ধেহী' তি। তস্মাৎ পুত্রস্য জাতস্য নাম কুর্য্যাৎ পাপ্মানমেবাস্য তদপহন্ত্যপি দ্বিতীয়মপি তৃতীয়মভি-পূর্ব্বমেবাস্য তৎপাপানমপহন্তি। তমব্রবীদ্রুদ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্না-মাকরোৎ অগ্নিস্তদ্রুপমভবৎ অগ্নির্বৈরুদ্রো যদরোদীৎ তস্মাৎ রুদ্রঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ সর্ব্বোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদাপস্তদ্রূপমভবন্নাপোবৈ সর্ব্বোঽস্ত্যোহি ইদম্ সর্ব্বম্ জায়তে। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ পশুপতিরসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ ওষধয়স্ত-দ্রূপমভবন্নোষধয়ো বৈ পশুপতি স্তস্মাদ্যদা পশব ওষধি র্লভন্তেঽথ পতীয়স্তি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ উগ্রোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ বায়ুস্তদ্রূপমভবৎ বায়ুর্বোগ্রস্তস্মাৎ যদা বলবদ্বাতি উগ্রো বাতি ইত্যাহুঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীদশনিরসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোদ্বিদ্যুৎ তদ্রূপমভবৎ বিদ্যুদ্বা অশনিস্তস্মাদ্যম্ বিদ্যুদ্ হন্ত্যশনিরবধীদিতি আহুঃ। সোঽব্রবীজ্জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ভবোঽ-সীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ পর্জ্জন্যস্তদ্রূপমভবৎ পর্জ্জন্যোবৈ ভবঃ। পর্জ্জন্যাৎ হীদম্ সর্ব্বম্ ভবতি। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ মহান্দেবোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোচ্চন্দ্র-মাস্তদ্রূপমভবৎ প্রজাপতি র্বৈ চন্দ্রমাঃ প্রজাপতি র্বৈ মহান্ দেবঃ। সোঽব্রবীৎ জ্যায়ান্ বা অসতোঽস্মি ধেহ্যেব মে নামেতি। তমব্রবীৎ ঈশানোঽসীতি। তদ্যদস্য তন্নামাকরোৎ আদিত্যস্তদ্রূপমভবৎ আদিত্যো বা ঈশান আদিত্যোহি অস্য সর্ব্বস্য ঈষ্টে। সোঽব্রবীৎ এতাবান্বাস্মি মা মেতঃপরোনামধেতি। তান্যেতান্যষ্টাবগ্নিরূপাণি কুমারো নবমঃ।"

অর্থাৎ

"এই অধিষ্ঠান ছিল। তাহা ভূমি হইল। তাহা বিস্তৃত করা হইলে

পৃথিবী হইল। এই অধিষ্ঠানে ভূত সকল ও ভূত সকলের পতি সম্বৎসর দীক্ষিত হইলেন। ভূতদিগের পতি গৃহপতি ছিলেন, উষা পত্নী। এই যে ভূত সকল তাহারাই ঋতু; এই যে ভূত সকলের পতি সে সম্বৎসর। আর এই যে পত্নী উষা সে ঔষসী। এই ভূত সকল ও তাহাদিগের পতি সম্বৎসর উষাতে বীজক্ষেপ করিলেন। সম্বৎসরে কুমার জন্মিল। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহাকে প্রজাপতি বলিলেন, "কুমার কেন কাঁদিতেছ? অনেক শ্রমে ও তপস্যায় তোমার জন্ম।" সে বলিল, "আমার পাপ যায় নাই, আমার নাম নাই, আমাকে নাম দাও।" এই নিমিত্ত পুত্র জন্মিলে তাহার নামকরণ করিবে; ইহাতে তাহার পাপনাশ হয়; এইরূপ দ্বিতীয় ও তৃতীয় নাম দিবে; ইহাতেও পাপনাশ হয়; প্রজাপতি কুমারকে বলিলেন, "তোমার নাম রুদ্র হউক।" তাহার যখন এই নামকরণ হইল, অগ্নি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ অগ্নিই রুদ্র, রোদন করিয়াছিল বলিয়া রুদ্র। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি সর্ব্ব হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, জল তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ জলই সর্ব্ব, জল হইতে এ সকল জন্মিয়াছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি পশুপতি হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, ওষধি তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ ওষধিই পশুপতি; এই নিমিত্ত পশুরা ওষধি পাইলে পরাক্রান্ত হয়। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি উগ্র হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, বায়ু তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বায়ুই উগ্র, এই নিমিত্ত যখন প্রবল বাতাস বহিতে থাকে, লোকে বলে যে উগ্র বহিতেছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন "তুমি আশনি হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, বিদ্যুৎ তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ বিদ্যুৎই অশনি, এই নিমিত্ত যে বিদ্যুতের আঘাতে মরে, লোকে বলে অশনির (অর্থাৎ বজ্রের) আঘাতে মরিয়াছে। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ভব হইলে।" যখন তাহাকে এই নাম দেওয়া হইল, পর্জ্জন্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ পর্জ্জন্যই ভব, পর্জ্জন্য হইতেই সকল হয়। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি

বলিলেন, "তুমি মহাদেব হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, চন্দ্রমা তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ প্রজাপতিই চন্দ্রমা, প্রজাপতিই মহাদেব। সে বলিল, "আমি অসৎ হইতে শ্রেষ্ঠ, আমাকে নাম দাও।" প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ঈশান হইলে।" তাহাকে যখন এই নাম দেওয়া হইল, আদিত্য তাহার মূর্ত্তি হইল, কারণ আদিত্যই ঈশান, আদিত্যই এ সকল শাসন করিতেছেন; সে বলিল, "আমি এত হইয়াছি; আমাকে আর নাম দিও না।" অগ্নির এই আটটী মূর্ত্তি, কুমার নবম।"

শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে যে উপাখ্যানটী উদ্ধৃত হইল, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, রুদ্রের রূপে অগ্নিরই প্রবলতা, কিন্তু তথায় সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতিরও স্থান আছে। প্রাচীনকালে যে সকল দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, সকলই সময়ে সময়ে ভীম মূর্ত্তি ধারণ করিতেন। সূর্য্য কখন কখন দেশ দগ্ধ করিতেন। বায়ু সময়ে সময়ে বৃক্ষ উন্মূলিত, গৃহ ভগ্ন ও নৌকা জলমগ্ন করিতেন। অগ্নি কখন কখন লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিতেন। অশনির আঘাতে সময়ে সময়ে লোকের প্রাণ যাইত। প্রবল জলপ্লাবনে কখন কখন জনপদ সকল বিনষ্ট হইত। ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টিতে কখন কখন বিলক্ষণ অপকার করিত। মনোহর চন্দ্রমাও সময়ে সময়ে রাহুগ্রস্ত হইয়া ভয় বিস্তার করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক দেবতারই কখন কখন উগ্রভাগ লক্ষিত হইত। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্রই রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকলের উগ্রতার সমষ্টি লইয়া রুদ্রের বিরাটমূর্ত্তি বিরাজমান হইল। ইহাতে কালে কালে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি কেন না তাঁহার নিকটে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িবে? কি প্রকারে বৈদিক দেবতাদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়, স্থির করা সহজ নয়; কিন্তু এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, সমুদায় প্রাচীন দেবতার উগ্রভাব লইয়া শিবের এবং সৌম্যভাব লইয়া বিষ্ণুর সৃষ্টি, এবং এই কারণে লোকে ক্রমে অন্য দেবতা অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রতি অধিক ভক্তি দেখাইতে আরম্ভ করে। হয় ভয় নয় ভালবাসা এই দুইটীর মধ্যে কোন একটীর বশবর্ত্তী হইয়া সাধারণতঃ লোকে অতিমানসিক শক্তির উপাসনা করিতে যায়। ইহার মধ্যে একটী হইতে শৈবধর্ম্মের, এবং অপরটী হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্ত্তমান কালের শিব কেবল বৈদিক রুদ্র নহেন। তিনি লিঙ্গ-মূর্ত্তিতে পূজিত। অথচ বৈদিক ঋষিদিগের কোন উপাস্য দেবতাই লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া বর্ণিত নহেন, এবং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অতি প্রাচীন কালে অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল। স্মৃতরাং ভারতবর্ষীয় অনার্য্য জাতিদিগের নিকট হইতে আর্য্যেরা এ প্রকার শিবপূজা পদ্ধতি পাইয়াছিলেন, ইহা অনেক দূর সম্ভব। শৈব উপাসনা যে অনার্য্যভাবাপন্ন, নিম্নে তদ্বিষয়ে কয়েকটী প্রমাণ প্রদত্ত হইতেছে।

বেদে লিঙ্গোপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ আছে। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

"স শর্ধদর্যো বিষুনস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপিগুর্ঋতং নঃ।" (১)

অর্থাৎ "ইন্দ্র শত্রুদিগকে শাসন করুন যেন লিঙ্গোপাসকেরা আমাদিগের যজ্ঞের নিকট না আসিতে পারে।" ইহাতে বোধ হয় যে, যে দস্যুগণ আর্য্য ঋষিদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন করিত, তাহারা লিঙ্গোপাসক ছিল। রামায়ণের অনেক স্থানে বর্ণিত আছে যে রাক্ষসেরা যজ্ঞকালে মুনিদিগের প্রতি অনেক উৎপাত করিত। রাক্ষসেরা যে আর্য্যধর্ম্মদ্বেষী স্বতন্ত্রধর্ম্মাক্রান্ত অনার্য্য জাতি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। স্মৃতরাং উত্তরকালবর্ত্তী বর্ণনা দ্বারা বৈদিক শ্লোকার্থের সমর্থনই হইতেছে।

(২) স্মৃতিতে ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা নিষিদ্ধ দেখা যায়। বশিষ্ঠ স্মৃতিতে লিখিত আছে,

শূদ্রাদীনাস্তু রুদ্রাদ্যা অর্চ্চনীয়া প্রযত্নতঃ॥
যত্র রুদ্রার্চ্চনং প্রোক্তং পুরাণেষু স্মৃতিষ্বপি।
তদব্রহ্মণ্যবিষয়মেবমাহ প্রজাপতিঃ॥
রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ পুরাণেষু চ গীয়তে।
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে॥ (২)

অর্থাৎ

শূদ্রাদিদিগের যত্নপূর্ব্বক রুদ্রাদি অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পুরাণে ও স্মৃতিতে যেখানে রুদ্রার্চ্চনার কথা আছে তাহা ব্রাহ্মণের জন্য নহে, প্রজাপতি বলিয়াছেন। পুরাণে রুদ্রার্চ্চনা ও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা

(১) Muir's Sanscrit Texts, Vol. IV. p. 345 (First Edition).

(২) Quoted in Max Müller's History of Ancient Sanscrit Literature p. 55.

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের জন্য উক্ত হইয়াছে, অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্য নহে।

বৃদ্ধহারীতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,

রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রস্য ধারণং যত্র দৃশ্যতে।
তচ্ছূদ্রাণাং বিধিঃ প্রোক্তো ন দ্বিজানাং কদাচন॥

"রুদ্রার্চ্চন ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ যেখানে দৃষ্ট হয়, তাহা শূদ্রের জন্য প্রোক্ত বিধি দ্বিজের জন্য কদাচ নহে।"

(৩) রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে রাক্ষস ও দেবতাগণ মহাদেবের ভক্ত বলিয়া বর্ণিত, এবং মহাদেবকেও অনেক সময়ে তাহাদিগের প্রতি সদয় দৃষ্ট হয়।

(৪) ইতিহাসপুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞভঙ্গের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় শিব পূর্ব্বে যজ্ঞভাগ পাইতেন না, অনেক মারামারির পরে তিনি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন। রামায়ণে প্রথমে এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। হরধনুসম্বন্ধে জনক বলিতেছেন,

"দক্ষযজ্ঞবধে পূর্ব্বং ধনুরাযম্য বীর্য্যবান্।
বিধ্বস্য ত্রিদশান্ রুদ্রঃ সলীলমিদমব্রবীৎ॥
যস্মাদ্ ভাগার্থিনো ভাগান্ নাকল্পয়ত মে সুরাঃ।
বরাঙ্গাণি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বা॥
ততো বিমনসঃ সর্ব্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব।
প্রাসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ভবঃ॥
প্রীতশ্চাপি দদৌ তেষাং তান্যঙ্গানি মহৌজসাং।
ধনুষা যানি যান্যসন্ শাতিতানি মহাত্মনা॥
তদেতদ্ দেবদেবস্য ধনুরত্নং মহাত্মনঃ।
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তং অস্মাকম্ পূর্ব্বকে বিভো॥ (৩)

অর্থাৎ

"পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞনাশকালে বীর্য্যবান্ রুদ্র ধনুরাকর্ষণ করিয়া দেবতাদিগকে পরাজয় করত উপহাস করিয়া এই বলিয়াছিলেন, 'দেবগণ, আমি ভাগার্থী

Muir's Sanscrit Texts. Vol, IV. p. 312 (First Edition).

হইলেও তোমরা আমাকে ভাগ দাও নাই; আমি ধনুর্দ্বারা তোমাদিগের মহার্হ বরাঙ্গ সকল কর্ত্তন করি।' অনন্তর, হে মুনিপুঙ্গব, দেবতা সকল বিমনা হইয়া মহেশ্বরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি প্রীত হইলেন। মহাদেব ধনুর্দ্বারা মহাতেজঃসম্পন্ন দেবতাদিগের যাহার যে অঙ্গ কাটিয়াছিলেন, প্রীত হইয়া প্রদান করিলেন। এই সেই ধনুরত্ন, মহাদেব ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে ন্যস্ত করেন।"

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে অন্য দেবগণকে রথারোহণে দক্ষযজ্ঞে যাইতে দেখিয়া উমা পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনিও কেন যাইতেছেন না। মহাদেব উত্তর করিলেন,

"সুরৈরেব মহাভাগে পূর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতং।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ॥
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ॥" (৪)

অর্থাৎ

"হে মহাভাগে, দেবতাদিগের প্রাচীন অনুষ্ঠান এই যে কোন যজ্ঞেই আমার ভাগ নির্দ্দিষ্ট নাই। হে বরবর্ণিনি, পূর্ব্বপদ্ধতিনির্দ্ধারিত মার্গানুসারে ধর্ম্মতঃই দেবতারা আমাকে যজ্ঞে ভাগ দেয় না।"

(৫) শিবের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করা যায় না। বহ্বৃচ গৃহ্যপরিশিষ্টে লিখিত আছে,

অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্॥
তিথিতত্ত্বধৃতং বচনম্।

অর্থাৎ "পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি শিবনৈবেদ্য গ্রহণীয় নহে। শালগ্রামশিলাস্পর্শে সকল পবিত্র হয়।"

পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে

দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ।
ন নয়েচ্ছিবনির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ॥ (৫)

---

(৪) Muir's Sanscrit Texts, Vol. IV, pp. 313—14 (First Edition).

(৫) প্রাণতোষিণী। ৩৭৮ পৃষ্ঠা।

"শিবের দ্রব্য, অন্ন, ফল, জল কদাচ স্পর্শ করিবে না। শিব নির্ম্মাল্য লইবে না। সমুদয় কূপে নিক্ষেপ করিবে।"

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র শিবভক্ত কোন এক ব্যক্তির রচিত। তাহাতে মহাদেবকে জিজ্ঞাসিত হইতেছে,

দুর্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান নির্ম্মাল্যং তব দূষিতম্॥ (৬)

"হে কৃপানিধে, তোমার নির্ম্মাল্য ব্রহ্মাদির দুর্লভ। তবে, হে পরমেশ, তব নির্ম্মাল্য দূষিত কেন?"

মহাদেব উত্তর করিলেন যে তাঁহার কণ্ঠে বিষ আছে বলিয়া লোকে তাঁহার নির্ম্মাল্য ভক্ষণ করে না। উত্তর ঠিক হউক আর না হউক, মহাদেবের নৈবেদ্য যে গ্রহণ করা যায় না ইহা শিবভক্তেরাও স্বীকার করেন।

(৬) চণ্ডাল চর্ম্মকার প্রভৃতি অতি হেয় জাতিও স্বহস্তে শিবপূজা করিতে পারে। কিন্তু দ্বিজসহায়তা ব্যতিরেকে অন্য দেবতার পূজা হয় না। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে শিবপূজাপদ্ধতি অনার্য্যভাবাপন্ন, এবং তন্নিমিত্তই অনার্য্যবংশ-সম্ভূত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ আপনা আপনি মহাদেবকে অর্চ্চনা করিতে ও নৈবেদ্যাদি দিতে অধিকারী। আর বোধ হয় এই কারণেই শাস্ত্রে শিবনির্ম্মাল্য-গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৭) পুরাণাদিতে শিবের যে প্রকার মূর্ত্তি বর্ণিত আছে, তাহা সভ্য আর্য্য-জাতিদিগের কল্পিত বলিয়া প্রতীত হয় না। গলায় হাড়ের মালা, অঙ্গে ভস্ম-মাখা, মস্তকে সর্প, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম অথবা দিগম্বর, সঙ্গে ভূত প্রেত, সিদ্ধি ও ধুতুরা সেবনে চক্ষু রক্তবর্ণ ও বিকৃতাকার; উপাস্য দেবতার ঈদৃশ রূপ আর্য্য ঋষিদিগের চিন্তাসমুদ্ভূত না হইয়া অসভ্য দস্যুদিগের কল্পনার ফল হইবারও সম্ভাবনা।

কি প্রকারে অনার্য্য মহাদেব বৈদিক রুদ্রের সহিত এক বলিয়া গণ্য হইল, স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু অনুমান হয় যে স্বভাবসাদৃশ্য এরূপ একতার প্রতিপাদক হইয়াছিল। অনার্য্য মহাদেব এবং বৈদিক রুদ্র, উভয়েই ভীমমূর্ত্তি, উভয়েই উগ্রপ্রকৃতি। আর সাঁওতালদিগের উপাস্য গিরিদেব

---

(৬) শিবার্চ্চনদীপিকা। ১৪২ পৃষ্ঠা।

ও প্রাচীন অনার্য্য মহাদেব যদি একই দেবতা বলিয়া ধরা যায়, রুদ্রের গিরিশ নাম দ্বারাও একতা সংস্থাপনের একটি উপায় লক্ষিত হয়। যখন প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমি জয় করিয়া অনেক দস্যু প্রজা প্রাপ্ত হইলেন, এবং যখন উক্ত প্রজারা সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে দাস রূপে স্থান পাইল, তখন ধর্ম্মবিষয়ক অনেক বিবাদের পরে প্রজাদিগের প্রীতি লাভ দ্বারা রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন বাসনায় দ্বিজগণ এতদ্দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের পরম পূজনীয় মহাদেবকে রুদ্রমূর্ত্তি বলিয়া উপাস্য দেবতা দলভুক্ত করিয়া লন, এ প্রকার কল্পনা নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না। যদি এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি অপেক্ষা শিব কেন বড় হইয়া উঠেন, তাহার আর একটি কারণ বুঝা যায়। অনার্য্য ভারতবাসীদিগের সংখ্যা আর্য্যদিগের অপেক্ষা অধিক; সুতরাং অনার্য্য জাতিগণ হিন্দু সমাজভুক্ত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লোকের নিকটে শিবের সমাদরাধিক্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। একে ত রুদ্র সর্ব্বত্রই স্বীয় ক্রোধপ্রজ্বলিত মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র চন্দ্র, রবি বহ্নি অপেক্ষা আপনার প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার ভারতীয় লিঙ্গোপাসক দল তাহাকেই তাহাদিগের মহেশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, রুদ্রের ক্ষমতা কেন না অনিবার্য্য ও বহুবিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জড়জগৎ ও জীবমণ্ডলী এই দুইটী হইতে দেবোপাসনা ও লিঙ্গোপাসনা এই দুইটী উপাসনাপদ্ধতির উৎপত্তি। এই দুই প্রকার উপাসনার সংযোগে শৈব উপাসনা সংগঠিত, সুতরাং ভারতবর্ষে যে শিবপূজা বহুকাল প্রবল রহিয়াছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কোন্ সময়ে আর্য্য ঋষিগণ লিঙ্গোপাসনার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, নিশ্চয় বলা যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি পুরুষে ও বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদে যে লিঙ্গোপাসনার আভাস আছে, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই প্রতীতি হইবে। সুতরাং বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বে যে শিবশক্তির সমাদরের সূচনা হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় নহে।

শিব যে অনেক দেবতার সমষ্টি শিবানীর প্রতি দৃষ্টি করিলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কালী ও করালী এই দুইটী অগ্নি জিহ্বার নাম।*

---

* কালী করালী মনোজবাচ সুলোহিতাচ যাচ সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপীচ দেবী লেলায়মানা দহনস্য জিহ্বাঃ।

মুণ্ডক উপনিষদের টীকা।

পার্ব্বতী, হৈমবতী, গিরিজা এ সকল গিরিশায়ী বায়ুপত্নীর নাম। গৌরী নামটী সূর্য্যজায়া উষা হইতে প্রাপ্ত। প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি, শক্তি এ সকল নাম লিঙ্গোপাসনা হইতে সমুৎপন্ন তাহার সন্দেহ নাই।

ঐতিহাসিক ভ্রম। *

—০-:০:-০—

অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে বাঙ্গালিরা কখনও বিদেশ বিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যে দিন বখ্‌তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেনবংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদয় বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে, এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।

কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের বলা আবশ্যক হইতেছে যে বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালি বলিতে আমরা কি বুঝি। সর্ব্ববাদি-সম্মত কথা কহিবার উদ্দেশে আমরা মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম এ কয়েকটীকে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিব। সুতরাং আমাদিগের অবলম্বিত বাঙ্গালার চতুঃসীমা এইরূপ হইতেছে; উত্তরে, সিকিম ও ভোট-রাজ্য এবং গারো ও খস পাহাড়; পশ্চিমে, মহানন্দানদী এবং রাজমহল ও ছোটনাগপুরের পাহাড়; দক্ষিণে, সুবর্ণরেখানদী ও বঙ্গসাগর; পূর্ব্বে, চট্টগ্রাম-লুসাই-মণিপুর-পাহাড়শ্রেণী ও আসাম প্রদেশ। এই চতুঃসীমাবদ্ধ স্থানেই বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি। যদিও বাঙ্গালা ভাষা আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙ্গালিরা উড়িষ্যা, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন

---

* বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড ৫ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৮১।

করিয়াছেন, তথাপি বঙ্গদেশবহিঃস্থ বাঙ্গালির সংখ্যা এত অল্প যে তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গদেশের আর্য্যরাজত্বকালের পুরাবৃত্ত নাই। সুতরাং আমাদিগকে বিদেশীয় লেখক ও প্রাচীন অনুশাসনপত্রের সাহায্য অবলম্বন করিতে হইতেছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে যে এগুলি লিখিত দেশীয় ইতিহাস অপেক্ষাও প্রামাণ্য।

দ্বীপবংশ, মহাবংশ, রাজরত্নাকরী ও রাজাবলী এই চারিখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে সিংহলের পূর্ব্ববিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই চারিখানিতেই এই মর্ম্মের কথা আছে যে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়সিংহ, প্রজাপীড়ন দোষে নির্ব্বাসিত হইলে, সাত শত সঙ্গী লইয়া অর্ণবপোত আরোহণ করেন এবং অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কাদ্বীপে উপস্থিত হন ও তত্রত্য অধিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া সেখানকার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন; অনন্তর বিজয়ের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাস বঙ্গদেশ হইতে যাত্রা করিয়া মন্ত্রীর নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পাণ্ডুবাসই লঙ্কার ঐতিহাসিক রাজবংশের আদিপুরুষ; এবং সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া উক্ত দ্বীপের নাম সিংহল হইয়াছে। যে বৎসর বুদ্ধদেবের জীবনলীলা সমাপ্ত হয়, সেই বৎসর বিজয় লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন। সিংহলদেশীয় পণ্ডিতদিগের মত এই যে বুদ্ধদেবের তিরোভাব খৃষ্টাব্দের ৫৪৩ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটে; ভট্ট মোক্ষমূলর ও কনিংহাম সাহেব এই ঘটনার কাল খৃঃ পূঃ ৪৭৭ বৎসর বলিয়া স্থির করেন। যাহা হউক স্বীকার করিতে হইতেছে যে খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙ্গালিরা, বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির ন্যায়, সমুদ্রপথে সাহস পূর্ব্বক যাত্রা করিয়া বিদেশ বিজয় করিয়াছিল।

বিদেশীয় লেখক পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আমরা দুইখানি অনুশাসনপত্রের কথা বলিব। একখানি মুঙ্গেরে ও অপরখানি বুদাল নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এ দুইখানির ইংরাজী অনুবাদ এসিয়াটিক রিসার্চ্চের প্রথম খণ্ডে আছে। (১) প্রথমখানি গৌড়াধিপতি দেবপাল দেবের প্রদত্ত। উহাতে লিখিত আছে যে তাঁহার বিজয়ী সেনা তখন মুদ্গগিরিতে অর্থাৎ

(১) See Asiatic Researches Vol. I.

মুঙ্গেরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল; সেখানে বহু জন্ম নদীর উপর যে নৌসেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাকে পর্ব্বতশ্রেণী বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিত; সেখানে উত্তরদেশীয় নরপতিগণ এত অশ্ব পাঠাইতেন যে, তাহাদিগের পদধূলিতে দিক্ অন্ধকার হইত; সেখানে জম্বুদ্বীপের এত ক্ষমতাশালী নৃপালগণ সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিতেছিলেন যে, তাঁহাদিগের পরিচারকবর্গের পদভরে পৃথিবী বসিয়া যাইতেছিল। (২) বিজয়ী সেনা ও সামন্ত ভূপতিনিচয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা দেবপাল যে অনুশাসনপত্র বাহির করিতেছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিতেছেন যে গঙ্গোতরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এবং লক্ষীকূল হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত, সমুদায় স্থান তিনি জয় করিয়াছিলেন; এবং যুদ্ধার্থে তাঁহার ঘোটক সকল কাম্বোজদেশে উপস্থিত হইয়া কান্তাসন্দর্শনে আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। (৩) লক্ষীকূল পূর্ব্বদেশীয় লক্ষীপুর, এবং কাম্বোজদেশে রঘুবংশদৃষ্টে সিন্ধুনদের অপরপার্শ্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। রঘু পারসীক এবং হূণদিগকে পরাজিত করিয়া কাম্বোজদেশীয় রাজগণকে আক্রমণ করেন; এবং উক্তদেশে উৎকৃষ্ট অশ্বের উল্লেখও দেখা যায়। (৪) মুঙ্গেরের অনুশাসন পত্র পাঠ করিয়া

---

(২) "At *Mood-go-gheeree* where is encamped his victorious army, across whose river a bridge of boats is constructed for a road, which is mistaken for a chain of mountains ;...whither the Princes of the North send so many troops of horse that the dust of their hoofs spreads darkness on all sides ; whither so many mighty chiefs of *Jumboo Dweep* resort to pay their respects, that the earth sinks beneath the weight of the feet of their attendants, There *Deb Pal Deb* (who, walking in the footsteps of the mighty Lord of the great *Soogots*...) issues his commands."

(৩) "He who conquered the earth from the source of the Ganges as far as the well-known bridge, which was constructed by the enemy of *Dasaasyo* from the river of *Luckeecool* as far as the habitation of *Boroon*, who going to subdue other Princes, his young horses meeting their females at *Komboge*, they mutually neighed for joy."

(৪) কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা স্তুঙ্গা দ্রবিণরাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকা কোশলেশ্বরং॥ ৪র্থ সর্গ রঘুবংশ।

বোধ হয় যে গৌড়াধিপ দেবপাল দেব সমুদায় ভারতভূমির রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। বুদালের প্রস্তরলেখ্য দ্বারাও এই মতের সমর্থন হয়। এটী রাজপালবংশের একজন মন্ত্রীর আদেশানুসারে প্রস্তুত; এবং ইহাতে কেদার মিশ্র নামক এক ব্যক্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে, তাঁহার বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর বহুকাল নির্ম্মূলীকৃত উৎকলকুলের ও খর্ব্বীকৃতগর্ব্ব হূণদিগের দেশ, মহিমাবিচ্যুত দ্রাবিড় ও গুর্জ্জররাজের রাজ্য এবং সার্ব্বভৌম সমুদ্রমেখল রাজসিংহাসনে উপভোগ করেন। (৫)

বাঙ্গালিদিগের বিদেশবিজয় বিষয়ে আর একখানি অনুশাসনপত্রের উল্লেখ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব। অনেকে জানেন যে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; তাঁহারা এক সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; তাঁহারাই জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেবের মন্দির প্রস্তুত করান। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে তাঁহারাও বাঙ্গালি ছিলেন। পণ্ডিতগণাগ্রগণ্য উইল্‌সন্ সাহেব ম্যাকেঞ্জিসংগ্রহের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে কল্‌ভিন্ সাহেব যে অনুশাসনপত্র প্রাপ্ত হন, তদ্দৃষ্টে নির্ণীত হয় যে চোরঙ্গ গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ নহেন; যিনি কলিঙ্গে প্রথম উপস্থিত হন, তাঁহার নাম অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল; তিনি গঙ্গারাঢ়ীর অর্থাৎ গঙ্গাসন্নিহিত তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। এই ঘটনা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ঘটে। (৬)

বাঙ্গালিরা বিদেশ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির নবদ্বীপ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সেনবংশের রাজত্ব শেষ ও বাঙ্গালার স্বাধীন সূর্য্য অস্তমিত হয়

---

(৫) "Trusting to his wisdom, the king of *Gowr*, for a long time enjoyed the country of the eradicated race of *Ootkal*, of the *Hoons* of humbled pride, of the kings of *Dravir* and *Goorjar*, whose glory was reduced, and the universal sea girt throne."

(৬) "An inscription procured since Mr. Stirling wrote, by Mr. Colvin, shews that *Choranga* was not the founder of *Ganga Vansa* family, but that the first who came into *Kalinga* was *Ananta Verma*—Also called *Kolahala*, sovereign of *Ganga Rarhi*—the low Country on the right bank of the Ganges or *Tumlook* and *Midnapore*; this occurred at the end of the eleventh century of our era."

P. CXXXVIII, Wilson's Preface to Mackenzie Collection.

নাই। মিনহাজই সিরাজ বঙ্গদেশে আসিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির কোন কোন সঙ্গীর মুখে ১২০৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গবিজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন; "তবকৎ-ইনসিরী" নামক গ্রন্থে ইহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত; উহাতে লাক্ষ্মণেয় সেনের পলায়ন বর্ণনা করিয়া মিন্‌হাজ বলেন যে "রায় লাক্ষ্মণেয় সঙ্কনট ও বঙ্গাভিমুখে চলিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশের অধিপতি আছেন।" (৭)

বাস্তবিক বখ্‌তিয়ার কেবল লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় প্রদেশ অধিকার করেন; পদ্মার অপর পার্শ্ববর্ত্তী প্রকৃত বঙ্গদেশ জয় করিতে পারেন নাই। (৮) আরবী-পারসীবিদ্যাবিশারদ ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে বখ্‌তিয়ার খিলিজি সমুদায় বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায়; তিনি কেবল মিথিলার পূর্ব্বদক্ষিণাংশ, বরেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ, এবং বাগড়ির উত্তর পশ্চিমভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। বিজিত প্রদেশ উহার প্রধান নগরী হইতে লক্ষ্মণাবতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। (৯) "তবকৎইনসিরীতে" এবং মুসলমান রাজত্বকালের প্রথম শতাব্দীর কোন মুদ্রাতে সুবর্ণগ্রামের নামোল্লেখ না থাকাতে, ১২৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গ সেনবংশীয় রাজাদিগের হাতে ছিল, মিন্‌হাজের এই উক্তির সমর্থন হইতেছে। "তারিখিবরণি" নামক ইতিহাস গ্রন্থে বুলবনের রাজ্যশাসন সময়ে [১২৮০ খৃঃ অব্দে] সুবর্ণগ্রাম একজন স্বাধীন রাজার বাসস্থান বলিয়া প্রথম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়; কিন্তু তোগলক-সাহের সময়ে (১৩২৩ খৃঃ অব্দে) সোনার গাঁ ও সাতগাঁয় মুসলমান শাসন-

---

(৭) "Rai Lakhmaniya went towards Sanknat and Bengal, where he died. His sons are to this day rulers in the territory of Bengal."

See Elliot's History of India told by her own Historians.

(৮) "Distinct from the country of Lakhnauti is Banga, and in this part of Bengal the descendants of the Lakmaniyah kings of Nadiya still reigned in A. H. 658 or 1260 A. D. when Minhaji Siraj, the author of the Tabaqat, wrote his history."

H. Blochmann's Geography and History of Bengal.

(৯) "It would be wrong to believe that Bakhtyar Khiliji conquered the whole of Bengal; he merely took possession of the south-eastern parts of Mithila, Barendra, the northern portions of Rarh, and the northwestern tracts of Bagrhi. This conquered territory received from its capital the name of Lakhnauti."

Blochmann's History and Geography of Bengal.

কর্ত্তা প্রবেশ করিয়াছে, এবং সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও লক্ষ্মণাবতী এই তিনটী সম্মিলিত প্রদেশের সাধারণ নাম "বাঙ্গালা" হইয়াছে। (১০)

একপ্রকার প্রদর্শিত হইল যে, যদিও ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালায় উপস্থিত হয়, তথাপি সেনবংশ ধ্বংস করিতে তাহাদিগের প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছিল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে এই ঘটনার পরেও মুসলমানদিগের প্রভুত্ব এদেশের কোন কোন স্থলে কখনও সংস্থাপিত হয় নাই এবং কোন কোন স্থলে বহুকালান্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ব্লক্‌ম্যান সাহেব "বাঙ্গালার ভূবৃত্তান্ত ও ইতিহাস" নামক প্রস্তাবে এতদ্দেশীয় মুসলমান রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সেই সকলই আমাদিগের প্রধান অবলম্বন।

হণ্টর সাহেব বলেন যে বিষ্ণুপুরের রাজারা কখনও মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে নাই। (১১) ব্লক্‌ম্যান সাহেব এখানকার মুসলমান রাজ্যের পশ্চিম সীমা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই মতের প্রতিপোষকতা হয়। তিনি কহেন, "দৃষ্ট হইবে যে এই সীমা দ্বারা কাহালগাঁর দক্ষিণ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত সমুদায় সাঁওতাল পরগণা, পাচেট, এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের রাজ্য, বর্জ্জিত হইতেছে।" (১২)

---

(১০) "Minhaj's remark that Banga was, in 1260, still in the hands of Lakhman Sen's descendants is confirmed by the fact that Sunnargaon is not mentioned in the Tabaqat ; nor does it occur on the coins of the first century of Mahomedan rule. It is first mentioned in the *Tarikhi Barini*, as the residence, during Balban's reign, of an independent Raj ; but under Tughluq Shah (A. D. 1323) Sunnargaon and Satgaon, which likewise appears for the first time, are the seats of Mahomedan governors, the term Bangalah being now applied to the united provinces of Lakhnauti, Satgaon and Sunnargaon."

See also p. 238, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I. 1873.

(১১) See Hunter's Rural Bengal.

(১২) "This boundary, it will be seen, excludes the whole of the Santal Parganahs from the south of Kahalgaon to the Barakar, Pachet and the territory of the Rajahs of Bishnupur (Bankura).

দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও হিজলি ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উক্ত বৎসর হিন্দু সেনাপতি কালাপাহাড়ের প্রভাবে তাহা উৎকল সহ বঙ্গেশ স্থলেমান সাহের হস্তগত হয়। (১৩)

দক্ষিণে আকবরের সময়েও আমরা প্রতাপশালী প্রতাপাদিত্যের নাম শুনিতে পাই। আকবরনামা দৃষ্টে জানা যায় সুন্দরবনের সন্নিহিত প্রদেশে (১৫৮৪ খৃঃ অব্দে) মুকুন্দ নামে একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু জমীদার ছিলেন। ফরিদপুরের সম্মুখস্থ "চর মুকুন্দিয়া" নামক দ্বীপে তাঁহার নামের চিহ্ন অদ্যাপি রহিয়াছে। তিনি দিল্লীর সম্রাটের একজন সেনানায়ককে নিহত করেন; এবং তদীয় পুত্র শত্রুজিৎ জাহাঙ্গীর সাহের প্রতিনিধি বঙ্গীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে কর দিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্ট দেন। শত্রুজিৎ কুচবেহারের রাজার সহিত যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে সাহাজাহানের রাজত্ব সময়ে (১৬৩৬ খৃঃ অব্দে) বন্দীকৃত ও বিনাশিত হন। (১৪)

পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা, ভুলুয়া, নওয়াখালি, এবং চট্টগ্রাম বহুকাল বিবাদভূমি ছিল; খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সেগুলি প্রায় ত্রিপুরার ও আরাকানের রাজাদিগের অধিকৃত ছিল। রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকা নগরীতে

(১৩) "I mentioned Mahal Mandalghat at the confluence of the Rupnarayan and the Hughli as the south-western frontier of Bengal. The District of Medinipur and Hijli (south-east of Medinipur) were therefore excluded. They belonged to the kingdom of Orissa till A. H. 975, or A. D. 1567, when Sulaiman, king of Bengal, and his general Kala Pahar defeated Mukund Deb, the last Gajpati." G. H. B.

(১৪) "When Akbar's army, in 1574, under Munim Khan Khanan invaded Bengal and Orissa, Murad Khan one of the officers was dispatched to South-Eastern Bengal. He conquered, says the Akbarnamah, Sirkars Bakla and Fathabad, and settled there ; but after some time he came into collision with Mukund, the powerful Hindu zamindar of Fathabad and Bosnah, who, in order get rid of him, invited him to a feast and murdered him together with his sons...The name of Mukund still lives in the name of the large island 'Char Mukundia' in the Ganges opposite Faridpore...His son Satrujit gave Jahangir's governors of Bengal no end of trouble, and refused to send in the customary *peshkash* or do homage at the court of Dhaka. He was in secret understanding with the Rajahs of Koch Behar and Coch Hajo, and was at last, in the reign of Shahjahan, captured and executed at Dhaka (about 1636 A. D.)" G. H. B.

উঠিয়া আসিবার পরে বাঙ্গালার মুসলমান রাজ্যের সীমা ফণীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং ঔরেঙ্গেব পাদসাহের সময়ে চট্টগ্রাম হস্তগত হয়। (১৫) শ্রীহট্ট বিজয় .৩৮৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। (১৬) ত্রিপুরা, হিরম্ব বা কাছাড়, জয়ন্তী, খস, গারো এবং কারিবরি পর্ব্বত প্রদেশ, এ সকল মুসলমানদিগের রাজ্যভুক্ত হয় নাই। (১৭) আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে "ত্রিপুরা স্বাধীন; ইহার রাজার নাম বিজয় মাণিক্য। রাজাদিগের সকলের নামেই মাণিক আছে; এবং প্রধান বংশীয়দিগের নামে নারায়ণ আছে।" (১৮)

উত্তর বাঙ্গালার রাজগণ এমন পরাক্রান্ত ছিলেন যে তাঁহারা এক প্রকার স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেন। (১৯) যে গণেশ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ওয়েষ্টমেকট সাহেবের মতে তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ। (২০) রঙ্গপুরের উত্তরে কামতা নামে একটি রাজ্য ছিল; ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে হোসেন সাহের সময়ে উহা অধিকৃত হয়। (২১)

---

(১৫) "Tiparah, Bhaluah, Noakhali and District Chatgaon were contested ground, of which the Rajahs of Tiparah and Arakan were, at least before the 17th century, oftener masters than the Muhammadans. It was only after the transfer of the capital from Rajmahal to Dhaka, that the south-east frontier of Bengal was extended to the Phani River, which was the imperial frontier till the beginning of Aurangzib's reign, when Chatgaon was permanently conquered, assessed and annexed to subah Bangalah." G. H. B.

(১৬) "Silhat...was conquered in A. D. 1384." G. H. B.

(১৭) "The neighbouring countries to the east were Tiparah, Kachhar (the old Hirumba), the territories of the independent Rajahs of the Jaintish, Khasiah and Garo Hills, and, on the left bank of the Brahmaputra, the Karibari Hills, the zamindars of which were the Rajahs of Sosong." G. H. B.

(১৮) "Tiparah is independent; its king is Aijai Manik. The kings all bear the name of Manik, and the nobles that of Narayan."—Ain Akbari.

(১৯) "The Rajahs of Northern Bengal were powerful enough to preserve a semi-independence in spite of the numerous invasions from the times of Bakhtyar Khilji." G. H. B.

(২০) See Dinajpur Raj in the Calcutta Review.

(২১) "Kamata was invaded about 1498 A. D., by Husain Shah and legends state that the town was destroyed and Nilamba, the last Kamata Rajah, was iaken prisoner." G. H. B.

কামতা রাজবংশের তিরোভাবের পরে কোচরাজবংশের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে; পরিশেষে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ঔরেঙ্গেবের সেনাপতি মিরজুম্লা উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। (২২)

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল, তাহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে বখ্‌তিয়ার খিলিজির প্রায় একশত বৎসর পরে সেন বংশের রাজ্য ধ্বংস হয় এবং তদনন্তরও বিষ্ণুপুর, পাচেট্, ত্রিপুরা, জয়ন্তী, এ সকল স্থানের রাজগণ মুসলমানদিগের রাজত্বকালে আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তরে অনেক জমিদার বহুকাল স্বাধীন ছিলেন।

এক্ষণে আমরা জমিদারদিগের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। বিষ্ণুপুর, পাচেট্, দিনাজপুর, এই সকল স্থানের রাজারা এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশীয় মুকুন্দ ও শত্রুজিৎ জমিদারপদবাচ্য। ইহাতেই বুঝাইতেছে যে জমিদারেরা কেবল কর-সংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ের আমরা অপর প্রমাণ দিতেছি। আইন আকবরিতে লিখিত আছে যে সুবা বাঙ্গালার জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহারা ২৩,৩৩০ অশ্বারোহী, ৮,০১,১৫৮ পদাতিক, ১৭০ গজ, ৪,২৬০ কামান এবং ৪,৪০০ নৌকা দিয়া থাকে। (২৩) এরূপ যুদ্ধের উপকরণ যাহাদিগের ছিল, তাহাদিগের পরাক্রম নিতান্ত কম ছিল না। বাস্তবিক অনেক জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ না করিয়া কর আদায় করা যাইত না। সুবিখ্যাত পাদরি লং সাহেব ইংরাজ রাজ্যের প্রথম আমলের কাগজপত্রের যে সকল অংশ মুদ্রিত করিয়াছেন, তৎপাঠে জানা যায় যে তখন বর্দ্ধমান, বীরভূম, বিষ্ণুপুর এবং মেদিনীপুরের রাজারা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদিগের অনেক কষ্টের কারণ হইয়াছিলেন। (২৪)

---

(২২) "The Kamata family was succeeded by the Koch dynasty...... Aurangzib's army under Mir Jumlah took Koch Bihar on the 19th December 1661." G. H. B.

(২৩) "The Zemindars (who are mostly Koits) furnish also 23,330 cavalry, 801, 158 infantry, 170 elephants, 4,260 cannon and 4,400 boats." Gladwin's Ain Akbari Vol. II.

(২৪) 'See Selections from Indian Records, edited by the Rev. Mr. Long.

১৮২১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার কমিশনর ষ্টারলিং সাহেব উক্ত দেশের ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে যে মিনিট লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে পূর্ব্বকালের জমিদারেরা কি ছিলেন এক প্রকার স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে; ঐ লেখার মর্ম্ম নিম্নে গৃহীত হইল। (২৫)

"উড়িষ্যা বন্দোবস্তের সময়ে আক্‌বরের মন্ত্রিগণ সিংহাসনচ্যুত রাজ-বংশের প্রধান শাখাগুলির ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা ন্যায় এবং রাজনীতির অনুমোদিত কার্য্য জ্ঞান করিলেন। তজ্জন্য বাস্তবিক উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র দেবকে, জমিদার আখ্যা দিয়া, খোড়দা এবং তথা হইতে পুরীসন্নিহিত সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত চারিটী পরগণা জমিদারীস্বরূপ প্রদত্ত হইল এবং এ নিমিত্ত খোড়দার রাজাদিগকে অদ্যাপি উড়িষ্যার জমিদার বলে। পূর্ব্বোক্ত আখ্যাসহকৃত রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে কেল্লা আউলের জমিদারী দেওয়া হইল; এ ব্যক্তি তেলেঙ্গা মুকুন্দদেবের বংশীয় বলিয়া রাজ্য

(২৫) "At the settlement formed by the ministers of Akber it was considered just and politic to make some provision for the principal branches of the family of the dethroned Hindoo Rajahs. To the actual heir, Ramchander Deo, therefore was assigned Khoordah and the four pergunnas extending from thence to the sea at Pooree, as a zamindaree, with the title of Zamindar, and the Rajahs of Khoordah have been in consequence down to the present day styled zemindars of Orissa. The zemindaree of Aul or Killah Aul on the eastern side of the district, was granted under the same title to another member of the Royal family (who claimed the Raj as descended from the last dependent Sovereign Telinga Mokoond deo); and Killah Puttia Sarrungurh to a third, with the zemindaree of two or three pergunnahs long since resumed,

"These descendants of the Royal family and Shewuks or hereditary officers of State, were the only officially recognized zemindars in Cuttack for a period of more than a century and a half after the reign of Akber. Their situations answer to the sense in which the term zemindar is used by Ferishteh, who invariably speaks of the Rayan O Zemindaran Dukhun as powerful and formidable chiefs, commanding troops, and possessing forts like the Barons of the middle ages. They succeeded by inheritance, exercised powers of life and death within their Lordships or jurisdictions, maintained forces proportioned to their means, and paid, if any thing, only a light tribute, as their tenure was that of military service."

Stirling's Minute appended to Toynbee's History of Orissa.

প্রার্থী ছিল। কেল্লা পুটিয়া সারঙ্গগড় এবং দুই তিন পরগণার জমীদারি তৃতীয় এক জনকে প্রদত্ত হয়; উহা অনেক দিন হইল বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

"আকবর সাহের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পর পর্য্যন্ত এই রাজবংশীয় ব্যক্তিবর্গ এবং পুরুষানুক্রমিক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত আর কেহই কটকে জমীদার বলিয়া রাজদ্বারে স্বীকৃত হইত না। ফেরেস্তা 'দক্ষিণের রায় ও জমীদারদিগকে' পরাক্রান্ত, সেনাবলবিশিষ্ট, এবং বহুদুর্গাধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই ফেরেস্তা যে অর্থে জমীদার শব্দের প্রয়োগ করেন, পূর্ব্বোল্লিখিত জমীদারদিগের পদ তদনুরূপ ছিল। উত্তরাধিকারের নিয়মানুসারে তাঁহারা বিষয় সম্পত্তি পাইতেন; আপন আপন প্রভুত্বাধীন স্থানে জীবনমৃত্যু-বিধান শক্তি ধারণ করিতেন; সাধ্যানুরূপ সৈন্য রাখিতেন; এবং যদি কিছু দিতে হইত, অতি সামান্য করই দিতেন।"

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু লিখিত হইল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে পূর্ব্বকালের জমীদারদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীন ছিলেন, এবং কেহ বা বর্ত্তমান রাজপুতনার করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন। তাঁহাদিগের সৈন্য ছিল, গড় ছিল এবং তাঁহারা স্বত্বাস্বত্বের বিচার করিতেন ও অপরাধের দণ্ড দিতেন। মুসলমানদিগের সময়ে বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ স্থলে হিন্দু জমীদার ছিল; সুতরাং প্রায় সর্ব্বত্রই শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও হিন্দুসমাজ প্রচলিত রীত্যনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। রাজধানী সন্নিহিত স্থান ব্যতীত কোথাও মুসলমান রাজাদিগের সহিত প্রজাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না।

শ্রীহর্ষ। *

সংস্কৃত চিত্রশালিকার দুইখানি মহামূল্যচিত্র শ্রীহর্ষ নামাঙ্কিত, রত্নাবলী ও নৈষধ। রত্নাবলী অবলা, সরলা, কোমলাঙ্গী অঙ্গনা; অলঙ্কারবাহুল্য বিনাও দেখিতে সুন্দরী। নৈষধ তেজস্বী, চিন্তাশীল, দৃঢ়কায় বীরপুরুষ;

* বঙ্গদর্শন বৈশাখ, ১২৮১।

মেঘদূতের। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও বিবিধ অলৌকিক অলঙ্কারে সজ্জিত। দেখিলে কোন ক্রমেই দুইটী এক হস্তের চিত্রিত বলিয়া বোধ হয় না। লোকেরও বিশ্বাস এই [illegible] যে দুখানি দুজন চিত্রকরের রচিত। তাঁহারা কে, এবং কোন্ সময়ে কোথায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই সকল কথা লইয়া তত্ত্বজ্ঞ সমাজে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামদাস [illegible] একবার বঙ্গদর্শনের এতৎপ্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা; এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ তিনিই নৈষধ-কার। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর আইসে, তাহাতে বোধ হয় যে এই দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে, এবং কোনটীর পক্ষেই কোন প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। এজন্য যাহা কিছু আমার বক্তব্য আছে, সত্যানুরোধে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হয়ত আমারও ভুল হইবে; কিন্তু বারংবার কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে, সত্যের পথ যে পরিষ্কার হয় তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় ঐতিহাসিকতত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যে আমাদিগের পদস্খলন হইবে, বিচিত্র নহে। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত নিবিড়তিমিরাচ্ছন্ন। অন্ধকারে অনুমানরূপ লোষ্ট্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক পথের পরিচয় করিয়া আমা-দিগকে অগ্রসর হইতে হয়। ইতিহাস ও জীবনচরিত পাওয়া যায় না, বলিলেই চলে। বোধ হয় যেন আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এতদ্বিষয়ক গ্রন্থ লিখিতে ভাল বাসিতেন না। হয়ত প্রকৃতিপুস্তকপাঠে এবং ঐশ্বরিক চিন্তায় তাঁহারা এমন নিমগ্নচিত্ত ছিলেন যে, নশ্বর মানব জীবনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে তাঁহাদিগের প্রায়ই প্রবৃত্তি হইত না। যেখানে বুদ্ধদেবের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া মনুষ্যের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই পর্ব্বত-পরিবৃত কাশ্মীর ও সাগরবেষ্টিত সিংহলের ইতিহাস আছে; তৎসাহায্যে, এবং প্রাচীন মুদ্রা, অনুশাসন পত্র, খোদিত প্রস্তর, বা সাহিত্য দর্শনাদি গ্রন্থান্তর্গত উল্লেখ দেখিয়া আমাদিগকে তত্ত্বনিরূপণ করিতে হয়।

কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ রত্নাবলীর রচয়িতা, এই মত অধ্যাপকশ্রেষ্ঠ

উইল্‌সন সাহেব উদ্ভাবন করেন। রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষ নামক নৃপতির বৃত্তান্ত আছে; কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার, একথার বিন্দুবিসর্গও নাই। কেবল এই মাত্র লিখিত আছে যে, "তিনি অশেষদেশভাষাজ্ঞ, সর্ব্বভাষায় সৎকবি, সর্ব্ববিদ্যানিধি বলিয়া দেশান্তরেও খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

"সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃৎস্নবিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি॥"

৬১১ শ্লোক। ৭ম তরঙ্গ। রাজতরঙ্গিণী।

কেবল এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কাশ্মীরাধিপতি হর্ষদেবকে রত্নাবলীরচয়িতা বলা কতদূর সঙ্গত, পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তিনি যে রত্নাবলীকার নহেন, ইহার অপর প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" নামক গ্রন্থ মালবাধিরাজ ভোজদেবের কৃত। উক্ত গ্রন্থে রত্নাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণী দৃষ্টে বোধ হয় যে ভোজরাজ হর্ষদেবের পিতামহ অনন্তদেবের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। সপ্তম তরঙ্গের ১৯০ শ্লোকে অনন্তদেবের ইতিবৃত্তবর্ণনাবসরে লিখিত হইয়াছে যে,

"মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈঃ স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ডযোজনং কপটেশ্বরে॥"

যে গ্রন্থ পিতামহের সমকালীন লোকে উদ্ধৃত করিয়াছে, সে গ্রন্থ পৌত্রের লিখিত হওয়া অতীব অসম্ভব।*

আবার দেখা যাইতেছে যে ধনিকাপরনামা ধনঞ্জয় দশরূপনিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় মুঞ্জরাজের সভাসদ্ ছিলেন।

"বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্বন্মনোরাগনিবন্ধহেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশগোষ্ঠি-
বৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপমেতৎ॥"

মুঞ্জ ভোজদেবের পূর্ব্বে মালবাধিপতি ছিলেন। উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের গণনানুসারে ভোজদেব খৃষ্টীয় ১০৪২ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া-

* See the preface of Kavyaprakasa by Pandit Mahesh Chandra Nyayaratna.

ছিলেন; * একখানি অনুশাসন পত্রের লিখনানুসারে নির্ণীত হয় যে ভোজ-রাজের প্রপৌত্র এবং উদয়াদিত্যের পৌত্র যশোধর্ম্ম দেব ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন। † সুতরাং ভোজের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব বোধ হয় এ কথা নির্ব্বিবাদে বলা যায় যে ১০৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রত্নাবলী রচিত হইয়াছিল।

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায় উইল্‌সন্ সাহেব কহেন, শ্রীহর্ষদেব ১১১৩ হইতে ১১২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য শাসন করেন।" হর্ষদেব যদি ভোজরাজের পৌত্রদিগের সমকালীন লোক হন, তাঁহার রাজত্ব-কাল ঐরূপ সময়ে হইবারই সম্ভাবনা, এবং তিনি কোনক্রমেই রত্নাবলীরচয়িতা হইতে পারেন না।

এক্ষণে দেখা যাউক অন্য কোন শ্রীহর্ষের প্রতি রত্নাবলী আরোপ করা যায় কি না। রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুই খানি সংস্কৃত নাটক রাজা শ্রীহর্ষের রচিত বলিয়া উভয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হইয়াছে। নান্দ্যন্তে সূত্রধরের উক্তি উভয় গ্রন্থে প্রায় একই প্রকার। নান্দীতে দেখা যায় যে রত্নাবলীতে হরপার্ব্বতীকে, এবং নাগানন্দে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করা হইয়াছে। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, যে রাজার নামে গ্রন্থদ্বয় পরিচিত, তিনি এক সময়ে হিন্দু ও অপর সময়ে বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষদেব বা হর্ষবর্দ্ধন, যিনি একটী অব্দ সংস্থাপন করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। যখন কাদম্বরীকার বাণভট্ট "হর্ষচরিত" নামে তদীয় জীবনচরিত রচনা করেন, তখন বোধ হয় তিনি হিন্দু ছিলেন; নতুবা হিন্দু গ্রন্থকার তাঁহাকে বাড়াইতে যাইবে কেন? ‡ যখন চীন দেশীয় পর্য্যটক হুয়েন্থসাঙ্ এতদ্দেশ ভ্রমণে আগমন করিয়া, তাঁহাকে সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্-

---

* See Colebrooke's Miscellaneous Essays Vol. II. p. 462.

† Ibid pp. 298-304.

‡ হর্ষচরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হর্ষদেব যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশের আদি পুরুষ পুষ্পভূতি শৈব ছিলেন। শ্রীহর্ষের পিতা প্রতাপশীল বা প্রভাকরবর্দ্ধন সৌরমতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীহর্ষ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন ভণ্ডী নামক এক ব্যক্তির নিকটে শিক্ষিত হয়েন। রাজ্যশ্রী নাম্নী ভগিনীর উদ্দেশে বিন্ধ্য প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, হর্ষদেব দিবাকরমিত্র নামক একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দিবাকরমিত্র প্রথমে হিন্দু ছিলেন।

পদে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।* মধুসূদন "ভাববোধিনী" নাম্নী ময়ূরশতকের টীকায় লিখিয়াছেন যে বাণভট্ট যে শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত ছিলেন, সেই শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচয়িতা। মধুসূদনের গ্রন্থ সংবৎ ১৭১১, অর্থাৎ ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং আমরা যে মতের সমর্থন চেষ্টা পাইতেছি, তাহা অন্ততঃ দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে এতদ্দেশের পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য ছিল, এরূপ বোধ হয়।

শ্রীহর্ষ একজন দিগ্বিজয়ী রাজা। তিনি নাটকাদি লিখিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু রাজ্য বিস্তার দ্বারা তিনি যদ্রূপ যশোলাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বনামে গ্রন্থপ্রচারদ্বারা যশস্বী হইতে চেষ্টা পাইবেন, এবং তজ্জন্য লেখক-দিগকে প্রচুর অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। কাব্যপ্রকাশকার লিখিয়াছেন,

"শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনং।"

শ্রীহর্ষাদির নিকট হইতে ধাবক প্রভৃতির ধনপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

প্রকাশাদর্শে মহেশ্বর বলেন,

"শ্রীহর্ষো রাজা। ধাবকেন রত্নাবলীং নাটিকাং তন্নাম্না কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্।"

কাব্যপ্রকাশের টীকায় বৈদ্যনাথ লিখিয়াছেন,

"শ্রীহর্ষাখ্যস্য রাজ্ঞোনাম্না রত্নাবলীনাটিকাং কৃত্বা ধাবকাখ্যকবির্বহুধনং লব্ধম্ ইতি প্রসিদ্ধম্।"

অন্যান্য সংস্কৃত লেখকও এইরূপ কথা কহিয়াছেন। ঈদৃশ চিরাগত প্রবাদ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না।

কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে,

"প্রথিতযশসাং ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।"

প্রথিতযশা ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদির প্রবন্ধ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান কবি কালিদাসের কৃত গ্রন্থের কেন বহুমান করিতেছ?

* খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দের।

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে ধাবক একজন প্রসিদ্ধ নাটকলেখক। কিন্তু তাঁহার কৃত কোন নাটক পাওয়া যায় না; কেবল এই মাত্র প্রবাদ আছে যে তিনি রত্নাবলী রচয়িতা। বোধ হয় মালবিকাগ্নিমিত্রকার এই প্রবাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপরি উদ্ধৃত শ্লোক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ধাবক যখন কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, তখন তিনি কি প্রকারে কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষের সমকালীন হইবেন? কালিদাস হয়ত খ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, নতুবা তিনি মাতৃগুপ্ত হইলেও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক; কিন্তু চীনপর্য্যটকবর্ণিত শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রাজা। ইহার উত্তর নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"ভোজ-প্রবন্ধ" পাঠে জানা যায় যে ভোজরাজের সভায় এক জন কবি কালিদাস ছিলেন। আমার বিবেচনায় তিনিই "মালবিকাগ্নিমিত্র" লেখক। রচনা প্রণালী ও কবিত্বের বিচার করিয়া দেখিলে এমন বোধ হয় না যে, যে রসময়ী লেখনী হইতে শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, মেঘদূত, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব বিনির্গত হইয়াছে, সেই লেখনীই আবার মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রসূতি। ভাষা ও কল্পনা সম্বন্ধেও যেমন, তেমনই আন্তরিক মহত্ত্বসম্বন্ধেও মালবিকাগ্নিমিত্রকার রঘুবংশকার অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। মালবিকাগ্নিমিত্রকার অহঙ্কারের অবতার, রঘুবংশকার মূর্ত্তিমান বিনয়। যে কালিদাস মহাকাব্যশিরোভূষণ রঘুবংশ লিখিতে গিয়া প্রাচীন কবিগণের গুণে মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন,

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবোবংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"*

---

* কোথায় বা সূর্য্যপ্রভব বংশ ও অল্পবিষয়মতি আমিই বা কোথায়? আমি মোহবশতঃ ভেলায় চড়িয়া দুস্তর সাগর পার হইতে যাইতেছি। উন্নতকায়ব্যক্তিলভ্যফললোভে উত্তোলিত-বাহু বামনের ন্যায় মূঢ়তা বশতঃ কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া আমি উপহাসাস্পদ হইব। অথবা বজ্র-

সেই কালিদাস কি ধাবকসৌমিল্লপ্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রকারের ন্যায় সামান্য গ্রন্থ লিখিতে গিয়া বলিতে পারেন,

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ।" *

যদি মালবিকাগ্নিমিত্রকার কালিদাস ভোজরাজের সভাসদ্ হন্, তাহা হইলে তিনি যে রত্নাবলীকার ধাবককে প্রাচীন কবি বলিয়া উল্লেখ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজ স্বয়ং "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" রত্নাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। হর্ষদেব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। চীনদেশীয় পর্য্যাটক হুয়েন্থসাঙ্ ও প্রাচীনমুদ্রা প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় ৬০৮ হইতে ৬৪৮ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। ধাবক শ্রীহর্ষের সময়ে, সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রকারের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

রত্নাবলীকার শ্রীহর্ষের বিষয়ে যাহা যাহা আমার বক্তব্য ছিল, এক প্রকার বলা হইল। এক্ষণে নৈষধকার শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে।

নৈষধচরিতে শ্রীহর্ষ আপনার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর, মাতার নাম মামল্লদেবী, তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে তাম্বুলদ্বয় ও আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; † এবং "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়া-

---

কৃতছিদ্র মণিমধ্যে যেমন সূত্র প্রবেশ করে, তদ্রূপ পূর্ব্বপণ্ডিতগণকৃত বাক্যদ্বার দিয়া আমি এই বংশে প্রবেশ করিব।

* পুরাতন সকলই ভাল নহে; নূতন কাব্য সকলই নিন্দনীয় নহে। সাধুগণ পরীক্ষা করিয়াই দুইটীর মধ্যে একটীর প্রতি ভক্তি দেখান; মূঢ়েই পরের বুদ্ধি দ্বারা নীত হয়।

† "তাম্বুলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ"। ২২শ সর্গ।

ছিলেন। * এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি "অর্ণববর্ণনকাব্য," "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" "নবসাহসাঙ্ক চরিত" প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। † সুতরাং এরূপ অনুমান করা অন্যায় নহে যে তিনি কান্যকুব্জ নগরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন ও মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়াছিলেন; নতুবা কান্যকুব্জে বসিয়া গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত বা সমুদ্র বর্ণনা লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কেন? আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে একজনের নাম শ্রীহর্ষ ছিল। কুলাচার্য্যেরা বলেন,

ভট্টনারায়ণোদক্ষোবেদগর্ভোঽথছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছন্দড়ঃ॥
ভরদ্বাজকুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথা বেদ ইতি স্মৃতঃ॥

বিদ্যাসাগরোদ্ধৃত কুলাচার্য্য বচন।
বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক। ১৬ পৃষ্ঠা।

সুতরাং শ্রীহর্ষ কাশ্যপ গোত্রজ চট্টোপাধ্যায় কুলের পূর্ব্ব পুরুষ নহেন, ভরদ্বাজগোত্রীয় মুখোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ। যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে আদিশূর এদেশে আনিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত; এবং তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক বীররসপ্রধান নাটকের রচয়িতা। হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ যে নৈষধকার হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। তিনি একজন প্রধান

---

* শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং
শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যম্।
গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তিভণিতিভ্রাতর্য্যয়ং তন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ॥ ৭ম সর্গ।

† সন্দৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য ব্যরংসীন্মহা-
কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৯ম সর্গ।
ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎক্ষোদক্ষমে তন্মহা-
কাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। ৬ষ্ঠ সর্গ।
দ্বাবিংশোনবসাহসাঙ্কচরিতে, চম্পূকৃতোঽয়ং মহা-
কাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ॥ ২২শ সর্গ

পণ্ডিত বলিয়া কান্যকুব্জে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; তিনি তদনন্তর গৌড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; এবং বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গম সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব। সুতরাং নৈষধকারের কয়েকটী পরিচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয়ভারদ্বাজকুলপিতা শ্রীহর্ষের আছে।

শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি, এরূপ প্রবাদ অনেক কাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে; কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় যে পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থ লিখেন, * তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে লিখিত আছে,

"গৌড়দেশে শ্রীহর্ষনামা এক পণ্ডিত। তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নলচরিত্রনামে কাব্য রচনা করিয়া বিবেচনা করিলেন যে রসযুক্ত ও মনোরম এবং গুণালঙ্কারযুক্ত এই প্রকার যে কাব্য সে কবিদিগের যশের নিমিত্ত হয়। তদ্ভিন্ন যে কাব্য সে উপহাসের নিমিত্ত হয়। অপর অগ্নিতে স্বর্ণের পরীক্ষা করিবেক এবং সভার মধ্যে কবিতাবেত্তাদিগের নিকটে কাব্যের পরীক্ষা করিবে। যে কাব্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ না করেন সে কাব্যেতে কবির কি ফল? পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারাণসী গেলেন। সেখানে গিয়া কক্কোকনামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন।"

মেধাবী কথা, পুরুষ-পরীক্ষা।

"চৈতন্য চরিতামৃত" পাঠে জানা যায় যে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িতে চৈতন্যদেব ভালবাসিতেন। সুতরাং বিদ্যাপতি চৈতন্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের

* সংস্কৃত মূল নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।—

"বভূব গৌড়বিষয়ে শ্রীহর্ষোনাম কবিপণ্ডিতঃ। স চ নলচরিতাভিধানং কাব্যং কৃত্বা পরামৃষ্টবান্, যতঃ

রসম্মানসগ্রাহি গুণালঙ্কারসংযুতম্।
কবীনাং যশসে কাব্যং হাস্যায়ান্যচ্চ জায়তে॥
অপরঞ্চ, অগ্নৌ পরীক্ষতে স্বর্ণং কাব্যং সদসি তদ্বিদি।
কিং কবেস্তেন কাব্যেন সদ্ভির্যন্নানুগম্যতে॥

ততস্তৎকাব্যং নীত্বা পণ্ডিতমণ্ডলীমুদ্দিশ্য বারাণসীং জগাম। তত্র চ কক্কোকনামানং পণ্ডিতং শ্রাবয়ামাস।

লোক। অতএব শ্রীহর্ষ যে বঙ্গদেশের কবি একথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক যে শ্রীহর্ষকে আদিশূরের সমকালীন লেখক বলিলে, কোন প্রকার অসঙ্গতিদোষ ঘটে কি না।

বাখরগঞ্জে একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে মাধব সেন ও কেশব সেন লক্ষ্মণ সেনের পুত্র, লক্ষ্মণ সেনের পিতা বল্লাল সেন, বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেন, এবং সেন রাজবংশের আদিপুরুষ বীরসেন। মালদহের নিকটস্থ দেপাড়ায় প্রাপ্ত একখণ্ড খোদিত প্রস্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিজয় সেনের পিতা হেমন্ত সেন, হেমন্ত সেনের পিতা সামন্ত সেন, এবং সামন্ত সেনের পিতা বীরসেন। বঙ্গবিজয়ের অত্যল্প কাল পরে মিনহাজুদ্দিন নামক মুসলমান ইতিহাসলেখক লিখেন যে বঙ্গের শেষ রাজা লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্য্যন্তই রাজা এবং আশিবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং লাক্ষ্মণেয়ের রাজ্যারম্ভ ১১২৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। লাক্ষ্মণেয় যদি লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র হন, এবং বীরসেনের অপর নাম বংশের আদি বলিয়া যদি আদিবীর বা আদিশূর হয়, তাহা হইলে লাক্ষ্মণেয়ের পূর্ব্বে সেন বংশীয় ৮ জন রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের রাজত্বকাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ভূয়োদর্শনানুরূপ গণনানুসারে গড়ে ১৬ বৎসর করিয়া ধরিলে, আদিশূরের রাজ্যারম্ভ ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং নৈষধরচয়িতা শ্রীহর্ষ, আদিশূরের সমকালীন লোক হইলে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, বলা যাইতে পারে। *

ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। † আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভোজরাজের সময় ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তৎপূর্ব্বে, নৈষধ রচিত হইয়াছে, জানা যাইতেছে। ইহাতে শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে আমাদিগের মতেরই সমর্থন হইতেছে।

---

* নৈষধকার শ্রীহর্ষ যে আদিশূরের আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে একজন, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই মত উদ্ভাবন করেন।

See Babu Rajendra Lala's paper on Mohendra Lala in the Journal of the Asiatic Society of Bengal,

† See Hall's preface to the *Vasavadatta* p. 18.

"পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছি যে শ্রীহর্ষের লিখিত একখানি গ্রন্থের নাম "নবসাহসাঙ্কচরিত," অর্থাৎ নূতন সাহসাঙ্ক রাজার জীবনচরিত। চীন পর্য্যটক হুয়েন্থসাঙের লেখায় এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায়; তিনি সপ্তম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বোধ হয় সেই প্রাচীন সাহসাঙ্ক হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের নাম নবসাহসাঙ্কচরিত করিয়াছিলেন। মহেশ্বরকৃত "বিশ্বপ্রকাশ" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে বা শেষভাগে সাহসাঙ্ক নামক একজন রাজা গাধিপুরে অর্থাৎ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ্বপ্রকাশ ১০৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১১১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার আপনার পরিচয়সূত্রে লিখিয়াছিলেন যে গাধিপুরস্থ সাহসাঙ্ক রাজার সভাবৈদ্য হইতে তিনি ছয় পুরুষ অন্তর। * যদি সাহসাঙ্ক দশম শতাব্দীর কান্যকুব্জের রাজা হন, তদীয় চরিত বঙ্গীয় শ্রীহর্ষ লিখিবেন ইহা বিচিত্র নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীহর্ষ "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" "নবসাহসাঙ্ক-চরিত" প্রভৃতি যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কোনটীই পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, সর্ব্বসাধারণে ঐরূপ গ্রন্থের বিশেষ আদর করিত না। যে রাজবংশের গুণবর্ণনা ঐ সকল গ্রন্থে থাকিত, সেই রাজারাই আগ্রহ করিয়া গ্রন্থগুলি রাখিতেন। পরে যখন মুসলমানেরা আসিয়া রাজ্যগুলি ধ্বংস করিয়াছেন, তখন উক্ত পুস্তকগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনুমান হয় যে যাহা কিছু ইতিহাসগ্রন্থ আমাদিগের ছিল, এই রূপেই বিলুপ্ত হইয়াছে। যদি অনেক লোকের ঐতিহাসিক রচনার প্রতি অনুরাগ থাকিত বা যদি কেহ মিথ্যাকল্পনাশূন্য সর্ব্বলোকহৃদয়রঞ্জন ইতিহাস লিখিতে পারিত, তাহা হইলে ঈদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু দেশীয় লোকের অননুরাগে বা উপেক্ষায় এবং বিদেশীয় বিজেতৃগণের বিদ্বেষে আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

* "A prince named Sahasanka must have occupied the throne of [Kanouj] about the middle of 10th century as Maheswara the author of Vishwaprakash in the year 1111, make himself sixth in descent from the physician of that monarch." p. 463, Vol. XV, Asiatic Researches.

চাঁদকবি নৈষধকার শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। চারিজন প্রাচীন কবির নাম করিয়া পরে লিখিয়াছেন,

নররূপং পচম্ম শ্রীহর্ষ সারং
নলৈরায়কণ্ঠং দিলৈ হ্যগুহারম্।

পঞ্চম, নরের প্রধান, সারকবি শ্রীহর্ষ, যিনি নল রাজার কণ্ঠে হৃদ্য হার দিয়াছেন।

চাঁদকবি পৃথ্বীরাজের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হয়। সুতরাং চাঁদ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক। তিনি যে শ্রীহর্ষের উল্লেখ করিবেন, আশ্চর্য্য নহে।

রামদাস বাবু লিখিয়াছেন,—

"সুবিখ্যাত জৈন লেখক রাজশেখর ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবন্ধকোষ' রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীহীরপুত্র শ্রীহর্ষদেব বারাণসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রের তনয় জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞায় নৈষধ-চরিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজশেখর জয়ন্তচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়ন্তচন্দ্র পঙ্গুল নামে বিখ্যাত এবং অনিহীল-বারা পত্তনের অধীশ্বর কুমার পালের সমকালবর্ত্তী। মুসলমান নৃপতিগণ ইঁহার বংশ এককালে ধ্বংস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার বুলর সাহেব কহেন, এই জয়ন্তচন্দ্র কাষ্ঠকুট ক্ষত্রিয় নৃপতি এবং ইনিই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কান্যকুব্জ ও বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। রাজশেখরের বিবরণ প্রামাণিক বোধ হইতেছে, কেন না, তাহার সহিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে।"

আমাদিগের বিবেচনায় রামদাস বাবু এ স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নৈষধ "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" উদ্ধৃত হইয়াছে, সুতরাং উহা ১০৪২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। রাজা জয়চন্দ্র ঐ সময়ের শতাধিক বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। তিন চারিশত বৎসর পরে যদি কেহ কল্পনা অবলম্বন করিয়া কোন গ্রন্থকারের জীবনচরিত লিখিতে যায়, সে গ্রন্থোক্ত পরিচয়-

* Quoted by Mr. Growse in the *Indian Antiquary*.

গুলি ঠিক রাখিলেই প্রামাণিক বিবরণ লিখিয়াছে বলা যাইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে অন্যরূপ প্রমাণ চাই। বিশেষতঃ রামদাস বাবু যখন শ্রীহর্ষকে আদিশূরের আহূত পঞ্চব্রাহ্মণের একজন বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তখন তাহাকে জয়চন্দ্রের সমকালবর্ত্তী কি প্রকারে বলিতে পারেন? জয়চন্দ্রের সময় ১১৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ৩৫ বৎসরের মধ্যে কি সমুদায় সেনবংশের রাজত্ব শেষ হইল? প্রামাণিক ইতিহাসকারদিগের মতে তখন ত বঙ্গে লাক্ষ্মণেয়ই রাজত্ব করিতেছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নৈষধকার শ্রীহর্ষ "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ইহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাতে বৃহস্পতিকৃত লোকায়ত সূত্র, বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক মত এবং শঙ্করাচার্য্যকৃত বাদরায়ণীয় সূত্রের ভাষ্যের উল্লেখ আছে; যথা,

"সোঽয়মপূর্ব্বঃ প্রমাণাদিসত্ত্বানভ্যুপগমাত্মা বাক্‌স্তম্ভনমন্ত্রো ভবতাভ্যুহিতো নূনং যস্য প্রভাবাদ্ভগবতা সুরগুরুণা লোকায়তসূত্রাণি ন প্রণীতানি তথাগতেন বা মধ্যমাগমা নোপদিষ্টা ভগবৎপাদেন বা বাদরায়ণীয়েষু সূত্রেষু ভাষ্যং নাভাষি।"

কোন্ সময়ে লোকায়ত সূত্র লিখিত বা মাধ্যমিক মত প্রচারিত হয়, বলা যায় না। বাণকৃত হর্ষচরিতে লোকায়তিক সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয়। বাণ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। কিন্তু রামায়ণের অযোদ্ধাকাণ্ডে ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লোকায়তবাদ লক্ষিত হয়। সুতরাং লোকায়ত মতের উল্লেখ দেখিয়া খণ্ডনলেখকের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে কোনরূপ অনুমানই করা যায় না। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশীয় পর্য্যাটক ফাহিয়ান এতদ্দেশে ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মতের উৎপত্তি কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। অতএব ইহা হইতেও শ্রীহর্ষের কাল নিরূপণ চেষ্টা বিফল হইতেছে।

সুবিখ্যাত কোল্‌ব্রুকসাহেব অনুমান করেন যে শঙ্কারাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে বা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হন।* সুতরাং যে খণ্ডন-

*See Colebrook's Essays Vol. I. p. 332. উইল্‌সন সাহেবেরও এই মত। See Wilson's Preface to his Sanskrit Dictionary p. xvii.

কার তৎকৃত ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি পরবর্ত্তী দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের বা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক হইবেন, বিচিত্র নহে। যাহা হউক, তিনি যে নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক নহেন, ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের অন্য একস্থল লইয়া শ্রীহর্ষের প্রাদুর্ভাবকাল সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলা যাইতে পারে।

"তস্মাদস্মাভিরপ্যস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পঠা।
ত্বদ্গাথৈবান্যথাকারমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি॥"

অর্থাৎ—

"এ নিমিত্ত কয়েকটী অক্ষরের অন্যথা করিয়া এই অর্থে তোমারই গাথা অবলম্বন করা আমার অসাধ্য নহে" এই বলিয়া খণ্ডনকার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী লিখিয়াছেন ;—

"ব্যাঘাতে যদি শঙ্কাস্তি নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধিঃ কুতঃ॥"

উদয়নাচার্য্যকৃত কুসুমাঞ্জলীকারিকায় ইহার প্রতিরূপ একটী শ্লোক দেখা যায়, যথা—

"শঙ্কা চেদনুমাঽস্ত্যেব নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মতঃ॥"

এতদ্দেশে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক শ্লোক লিপিবদ্ধ না হইয়া বহুকাল মুখে মুখে চলিয়া আইসে। সুতরাং এ কথা বলা যাইতে পারে না যে কুসুমাঞ্জলীকারিকার এই শ্লোকটী উদয়নের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, যদি ইহা সম্পূর্ণরূপেই উদয়নাচার্য্যের রচিত হয়, তাহা হইলে এই মাত্র জানা যাইতেছে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পরবর্ত্তী। কিন্তু উদয়ন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা কঠিন।

মহোদয় কাওএল সাহেব স্বকৃত কুসুমাঞ্জলীপ্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে বাচস্পতিমিশ্র শাঙ্করভাষ্যের "ভামতী" নাম্নী টীকা লিখেন, উদয়ন বাচস্পতিমিশ্র কৃত "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায়" * পরিশুদ্ধি জন্য "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎ-

* "ভামতী" ও "ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা" উভয়ই যে বাচস্পতিমিশ্রের লিখিত ইহা তৎকৃত স্বরচিত গ্রন্থের উল্লেখ দৃষ্টে জানা যায়।

‘ See Dr. Hall's Catalogue p. 87.

পর্য্যপরিশুদ্ধি” রচনা করেন এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে বারংবার উদয়নের কুসুমাঞ্জলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক, মাধবাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের। সুতরাং কাওএল সাহেব বলেন, আমরা অনেক ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া স্থির করিতে পারি যে বাচস্পতিমিশ্র খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে, এবং উদয়নাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ—আমরা এমন কোন প্রমাণ দেখি নাই যে “কুসুমাঞ্জলী” যে উদয়নের লিখিত, “ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি” ও সেই উদয়নের রচিত। দ্বিতীয়তঃ—যদি “ন্যায়াবর্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি’ কুসুমাঞ্জলীকার কর্ত্তৃক বাচস্পতিমিশ্রকৃত “ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টিকার” পরে লিখিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও অসম্ভব নহে যে উভয়ে শঙ্করাচার্য্যের পরে নবম ও দশম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ—আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্রকৃত “খণ্ডনোদ্ধার” নামক একখানি পুস্তক দেখিয়াছি। ইহাতে শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের আপত্তি মীমাংসা চেষ্টা আছে; যদি এই বাচস্পতিমিশ্র ভামতীকার হন, তিনি উদয়নের পরবর্ত্তী হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি ভামতীকার কি না, তাহার প্রমাণ নাই। চতুর্থতঃ—মাধবাচার্য্য স্বকৃত “শঙ্কর দিগ্বিজয় নামক” গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য শ্রীহর্ষকে সমসাময়িক লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ ও তৎপরাজয়াসমর্থ উদয়ন শঙ্করকর্ত্তৃক পরাভূত হন।*

গ্রন্থের অপর স্থলে সুরেশ্বরাচার্য্যকে শঙ্কর বলিতেছেন,

“বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াং
ভব্যাং বিধাস্যসিতমাং মম ভাষ্যটীকাম। †

অর্থাৎ—

“বাচস্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বসুন্ধরায় জন্ম গ্রহণ করিবে, এবং আমার ভাষ্যের টীকা করিবে।”

---

* ১৫শ সর্গ, “শঙ্কর দিগ্বিজয়” ১৫৭ শ্লোক।

† ১৩শ সর্গ, “শঙ্কর দিগ্বিজয়”।

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষকে শঙ্করের ন্যায় প্রাচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচস্পতি-মিশ্রকে তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন। পঞ্চমতঃ—যখন সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন জানা যাইতেছে যে ভোজরাজের পূর্ব্বে শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং যদি কুসুমাঞ্জলীকার শ্রীহর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হন, তাহা হইলে এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত হইতেছে যে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। নতুবা কল্পনা অবলম্বন করিয়া উদয়নকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া, শ্রীহর্ষকে তৎ-পরবর্ত্তী সময়ের লোক বলা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হয় না। ষষ্ঠতঃ—যদি এমন অকাট্য প্রমাণই পাওয়া যায় যে উদয়নাচার্য্য বাস্তবিক দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা হইলে সরস্বতীকণ্ঠাভরণের বলে বলিতে হইবে যে শ্রীহর্ষ উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কুসুমাঞ্জলীকারিকার যে শ্লোকের সহিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোদ্ধৃত শ্লোকের সাদৃশ্য আছে, সে শ্লোক কারিকা লিখনের পূর্ব্বে নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষ। *

(বৈদেশিক চিত্র)

অনেকে বিবেচনা করেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরকাল অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। সচরাচর ইতিহাস বলিতে লোকে যেরূপ বুঝে, তাহাতে এপ্রকার বিবেচনা করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কোন্

* বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮৫।

Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, by J. W. McCrindle, M. A., Principal of the Government College, Patna.

স্থানে পর্য্যায়ক্রমে কে কে রাজা ছিলেন; প্রত্যেক রাজা কোন্ সময়ে কত বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কতকাল রাজত্ব করেন; তাঁহার কয়টী ভ্রাতা, ভগিনী, মহিষী, পুত্র, কন্যা,—কত দাস, দাসী, অশ্ব, হস্তী, পদাতিক, ধন ছিল; তিনি কোন সময়ে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন, দিবারাত্রি মধ্যে কতবার নিদ্রা যাইতেন, এবং জাগরণ সময়ে কখন কি কার্য্য করিতেন; তিনি আহার বিহার বিষয়ে পরিমিতাচারী কি অমিতাচারী ছিলেন; কে কে তাঁহার প্রিয়পাত্র, সেনানী বা মন্ত্রী ছিল; কি পরিমাণে তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন; কতদূর তিনি আপনার, কতদূর বা পরের বুদ্ধি অনুসারে চলিতেন; কি কারণে কতবার তিনি সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কোন্ কোন্ নগর নগরী ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ দেশ নররুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন, স্বপক্ষ বিপক্ষ কতলোক শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কোথায় জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং কোথা হইতে বা ভগ্নমনোরথ হইয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ইতিহাসনামধারী অধিকাংশ গ্রন্থই এইরূপ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইহা বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজবংশাবলীর এপ্রকার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড দেশ, আয়তনে রুসিয়া, নরওয়ে ও সুইডেন বাদে ইউরোপখণ্ডের তুল্য, এবং অতি পূর্ব্বকাল হইতে অনেক রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজবংশের প্রত্যেক রাজার কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এরূপ উপকরণ রাখিয়া যান নাই। হয়ত, তাঁহারা নশ্বর মানবজীবনের ঈদৃশ ঘটনাবলী বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিতেন না। যাহা হউক, কোন কোন রাজবংশের নামাবলী, এবং কোন কোন রাজার দুই একটী মহৎকার্য্যের উল্লেখ ব্যতিরেকে এ সম্বন্ধে আমাদিগের বাসনা চরিতার্থ করিবার কোনরূপ সম্বল নাই।

কিন্তু এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উন্নতবুদ্ধি জ্ঞানিগণের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অল্পস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য। লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ

পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ ইতিহাস লিখিবার উপকরণ নাই আমরা মনে করি না। প্রথমতঃ আমাদিগের মন্ত্রময় ঋগ্বেদ আছে, ইহা হইতে তাৎকালিক সমাজের অবস্থা জানিতে পারা যায়। সে অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। তৎকালে আর্য্য দস্যু দুইবর্ণের সংগ্রাম চলিতেছিল। আর্য্যেরা শুক্লবর্ণ দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ। আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু প্রদেশ (পঞ্জাব) অধিকার করিয়া গঙ্গা যমুনা ও সরযূ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম এবং পুর বা নগরে বাস করিতেন। কোন কোন পুর শতভুজী, প্রস্তরনির্ম্মিত বা লৌহময় বলিয়া বর্ণিত। সমাজে কার্য্যবিভাগ দাঁড়াইয়াছিল। অধিকাংশ লোকে কৃষিকার্য্য করিত; অনেকে বাণিজ্য ব্যবসায় করিত; কতকগুলি যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল; কতকগুলি দেবপূজাদি করিত। কিন্তু ইহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইত না। রাজা সমাজপতি ছিলেন। রাজাদিগের বেশভূষার ও অবস্থানের বিলক্ষণ জাঁকজমক ছিল। সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট ও সহস্রতোরণশোভিত রাজপ্রাসাদ ও বহুচরপরিবেষ্টিত স্বর্ণবর্ম্মধারী রাজার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; ইহার মধ্যে কবিকল্পনা থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার মুলস্বরূপ অনেকটা সত্য আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের শাসন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন পুরে ও গ্রামে পুরপতি ও গ্রামণী নিযুক্ত ছিল। দেবপূজক পুরোহিতদিগের বিশেষ সম্মান দেখা যায়। কোন কোন রাজা তাহাদিগকে বহুসংখ্যক গো, অশ্ব, রথ ও স্বর্ণ দান করিতেন। বাণিজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এমন কি সমুদ্রপথে যাতায়াতের বর্ণনা পাওয়া যায়, এবং জানা যায় যে এই কার্য্যে শতদাঁড়বিশিষ্ট নৌকা (শতারিত্রাম্ নাবম্) নিযুক্ত হইত। সূত্রধর, ভিষক্, পুরোহিত, কর্ম্মকার, কবি, নর্ত্তকী, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়ের উল্লেখ লক্ষিত হয়। যব ও ধান্যের চাষ হইত, এবং কৃষিকার্য্যের উপকারিতা এতদূর অনুভূত হইয়াছিল যে বৃষ্টিদাতা ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করিবার নিমিত্ত কুল্যা অর্থাৎ খালও খনিত হইত। পালিত পশুমধ্যে অশ্ব, হস্তী, গো, মহিষ, মেষ, উষ্ট্র, কুক্কুর প্রভৃতি ছিল। আর্য্যগণ চিত্তোন্মাদক সোমরস বা সুরা পান করিতেন, গোমেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিতেন, এবং বিলক্ষণ মাংসাশী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল; পতির পরলোকান্তে বিধবা দেবরকে বিবাহ

করিতে পারিতেন; এবং সুন্দরী মহিলামণ্ডলী স্বয়ংবরা হইতে পারিতেন। দাম্পত্যবিধির উল্লঙ্ঘনের কথাও মাঝে মাঝে শুনা যায়। স্ত্রীলোকের বেশ-বিন্যাস ও হিরণ্ময় আভরণে অনুরক্তি ছিল। পুরুষেরা দ্যুতক্রীড়া ভাল বাসিতেন। নৃত্যগীতেও তাঁহাদের আমোদ ছিল, এবং যুদ্ধ করিতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহারা ধ্বজা উড়াইয়া সেনানীর অধীনে যুদ্ধে যাইতেন। যোদ্ধাদিগের মধ্যে রথীরাই প্রধান ছিলেন। ইঁহারা অশ্বযোজিত রথে চড়িয়া, দেহ বর্ম্মে ঢাকিয়া, ধনুর্ব্বাণহস্তে অগ্রসর হইতেন, বর্শা (ভল্ল), অসি, পরশু প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ইন্দ্র বা বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ঊষা, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন কোন ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে, সকল দেবতাই এক। তাঁহারা কৌশলময়ী ও ভাবপূর্ণা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এবং তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রেও কিছু উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঋক্ষ প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ জানিতেন, এবং মল মাস দ্বারা সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য করিতে শিখিয়াছিলেন। যে দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদিগের সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহারাও নিতান্ত অসভ্য ছিল না। যদিও তাহারা অনিন্দ্র, অব্রত, কৃষ্ণবর্ণ ও লিঙ্গোপাসক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ আছে, তথাপি তাহাদিগের পরাক্রম ও উন্নতাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রস্তরনির্ম্মিত বহুপুরের অধিপতি ছিল, এবং আর্য্যগণকে বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

কোন্ দেবতাকে তুষ্ট করিতে কি উদ্দেশে কোন্ যজ্ঞ করিতে হইবে এবং কোন্ সময়ে কি প্রকারে ঋগ্বেদের কোন্ মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাপার ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। এই সময়ে চতুর্ব্বর্ণভেদ ও ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য সংস্থাপিত হয়; বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের অতি সূক্ষ্ম নিয়ম হওয়াতে কিছু উপকার হয়। শুভক্ষণ বাছিয়া যজ্ঞ করিতে গিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদী নির্দ্ধারিত হওয়াতে নিশ্চিতফলপ্রত্যাশায় জ্যামিতি ও গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। স্বরসংযোগে বেদগান করিতে গিয়া সঙ্গীতের আলোচনা বৃদ্ধি হয়। অর্থ বুঝিয়া বেদপাঠ করিতে গিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের মূলপত্তন হয়। এদিকে কর্ম্মকাণ্ডের বাড়াবাড়ি

হওয়াতে গভীর চিন্তাশীল উপনিষৎকারগণ জ্ঞানপথে মোক্ষলাভের উপায় দেখিতে আরম্ভ করেন।

কল্পসূত্রে ও স্মৃতিতে কর্ম্মকাণ্ডের এবং দর্শনে জ্ঞানকাণ্ডের বিস্তার; আর ক্ষত্রিয় সুরগণের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ যে সকল গাথায় গীত হইয়া বহুকাল হইতে জনসমাজে আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিল, সেই সকল গাথা হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের উৎপত্তি। এই সকল গ্রন্থ হইতে দেশের অবস্থা অনেক দূর জানা যায়। তৎকালে প্রায় সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যদিগের অধিকৃত হইয়াছে, দক্ষিণাপথে কোন কোন স্থানে তাঁহাদিগের রাজ্য বিস্তার ঘটিয়াছে এবং অন্যান্য স্থানের বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছে। অনার্য্যজাতীয় অনেক লোক আর্য্যসমাজের নিম্নদেশে স্থান পাইয়াছে; এবং দস্যুগণের লিঙ্গোপাসনা আর্য্যধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের নামান্তর বলিয়া মধ্যে মধ্যে উপাসনার বিষয় ছিলেন, তিনি এখন একটী প্রধান উপাস্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যে রুদ্র বায়ু বা অগ্নির প্রচণ্ড মূর্ত্তিরূপে কখন কখন পূজিত হইতেন, তিনি লিঙ্গরূপী বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন। সমাজের শ্রেণীবন্ধন পাকাপাকি হইয়াছে, এবং জ্ঞানীরা তাহা ছেদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ সময়ে বুদ্ধদেবের উৎপত্তি। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে বাহ্য কার্য্য অপেক্ষা চরিত্রের উন্নতির দিকে দৃষ্টি পড়ে; এবং তাঁহার অহিংসাবাদ প্রভাবে রক্তস্রাবী বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের স্রোত অনেক দূর কমিয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে থাকে; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মগধে যৎ-কালে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকাল পর্য্যন্ত বৌদ্ধেরা প্রবল হইতে পারে নাই। চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে সুবিখ্যাত দিগ্বিজয়ী গ্রীক্ বীর আলেক্জণ্ডর পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হন। অনন্তর আলেক্জণ্ডরের মৃত্যু হইলে পর তদীয় সেনানী সেলুকাস আসিয়ার পশ্চিম বিভাগের অধিপতি হইয়া ভারতবর্ষ পুনরাক্রমণ করেন, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া প্রস্থান করেন। সেলুকস চন্দ্রগুপ্তকে একটী কন্যাদান করেন, এবং তাঁহার সভায় মেগাস্থিনিস্ অনেক দিন পাটলীপুত্রনগরে ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখেন। এই গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, কিন্তু

আরিয়ান (Arrian) এবং ডিওদরুস (Diodorus) ইহার যে চুম্বক লিখিয়াছেন, তাহা পাওয়া যায় ; এবং স্ত্রাবো (Strabo), প্লিনী (Pliny) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রোমক গ্রন্থকারদিগের লেখাতেও স্থানে স্থানে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা উদ্ধৃত আছে। ডাক্তার শানবেক নামক একজন জর্ম্মণ গ্রন্থকার এই সকল একত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং পাটনা কলেজের কলেজের অধ্যক্ষ ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব তাহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়ের ভারতবর্ষের একটী চিত্র প্রদান করিতে চেষ্টা করিব। মেগাস্থিনিস খ্রীষ্ট জন্মিবার আন্দাজ ৩০২ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন ভারতবাসীরা কখনও অন্যদেশ আক্রমণ করেন নাই, এবং আলেক্‌জণ্ডরের পূর্ব্বে আর কেহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করে নাই। পারসীকেরা ভারতবর্ষের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিল, এরূপ কথা আছে। সিন্ধু নদের পশ্চিমস্থিত প্রদেশের অনেকাংশ পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। আরিয়ানের ভারত বিবরণ* হইতে জানা যায় যে এই প্রদেশে হিন্দুজাতীয় লোকের বসতি ছিল, এবং তাহারা পারসীকদিগের অধীন হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কর দিত। কিন্তু তাঁহার মতে সিন্ধুনদই ভারতবর্ষের প্রকৃত পশ্চিম সীমা। হিন্দুদিগের সিন্ধু নদ পার হইতে নাই, এই প্রাচীন প্রবাদ দ্বারাও এই মতের সমর্থন হইতেছে ; মহাভারতের সময়ে গান্ধার অর্থাৎ বর্ত্তমান কাণ্ডাহার ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া গৃহীত হইত, কিন্তু গ্রীক গ্রন্থকারদিগের লেখা দেখিয়া জানা যাইতেছে যে, চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই হিন্দুরা সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী প্রদেশকে বিদেশ বিবেচনা কবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত দেখেন। এইরূপ চিরকালই দেখা যায়, এবং ইহাতেই কস্মিন্‌কালে সমগ্র ভারতবর্ষের একতাবন্ধন হয় নাই। যদি কোন ভূপতি কখনও প্রবল হইতেন, তিনি মহারাজাধিরাজ, রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তিনি বিজিত রাজাদিগের নিকটে কর পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন, আভ্যন্তরিক শাসন কার্য্যে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না। সুতরাং যদি

* The Indian of Arrian Section I.

পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে না পারিতেন, তাঁহার পরলোকান্তে সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। মেগাস্থিনিসের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ ছিলেন; তৎপৌত্র অশোকবর্দ্ধন তদপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের পূর্ব্বে এদেশীয় কোন রাজবংশেই বিস্তৃত সাম্রাজ্য বহুকাল স্থায়ী হয় নাই।

ভারতবর্ষের নগর অসংখ্য বলিয়া বর্ণিত। যে সকল নগর নদীতীরে বা সাগরোপকূলে অবস্থিত, সে সকল প্রায় কাষ্ঠনির্ম্মিত; যে সকল পাহাড় বা উচ্চ স্থলে অবস্থিত, সে সকল ইষ্টক ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত। মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নগর পাটলীপুত্র প্রাচ্য রাজ্যে গঙ্গা ও হিরণ্যবাহ (অর্থাৎ শোণ) এই দুইয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার বসতি দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল ছিল। সমুদয় নগর বেড়িয়া চারিশত হাত পরিসর ও ত্রিশ হাত গভীর একটী গড় খাত এবং ইহার পরে চৌষট্টি তোরণবিশিষ্ট এবং পাঁচ শত সত্তর বুরুজ (Tower) সজ্জিত প্রাচীর ছিল।

মেগাস্থিনিসের মতে ভারতবর্ষবাসীরা সাত শ্রেণীতে বিভক্ত; তন্মধ্যে পদমর্য্যাদায় সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ববিদ্গণ (Philosophers)। তাঁহারা যাগযজ্ঞে লোকের সাহায্য করেন, এবং প্রতিবৎসরের প্রারম্ভে রাজাদিগের কর্ত্তৃক মহাসভায় আহূত হন। তাঁহাদিগের মধ্যে যদি কেহ কোন হিতকর প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন, অথবা শস্য, পশুপালন বা সাধারণের উপকার সাধন সম্বন্ধে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা তিনি এই সভায় সর্ব্বসাধারণসমক্ষে প্রকাশ করেন। যদি কেহ তিনবার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া সাব্যস্ত হয়, তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইবে, এইরূপ দণ্ড দেওয়া হয়; আর যিনি প্রামাণিক কথা বলেন, তিনি করভার হইতে অব্যাহতি পান।

মেগাস্থিনিস্ বলেন যে তত্ত্ববিদ্গণ দুই দলে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা মান্য, কারণ তাহাদিগের মতের অধিকতর সঙ্গতি আছে। গর্ভ হইতেই তাহাদিগের প্রতি বিদ্বজ্জনের যত্ন আরম্ভ হয়; এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহারা উত্তরোত্তর সদ্গুণসম্পন্ন শিক্ষকের হস্তে পড়ে। তাহারা নগরের বাহিরে পরিমিত আয়তনের উপবনে বাস করে। তাহারা কুশাসনে বা মৃগচর্ম্মে শয়ন করে। তাহারা মাংসাহার ও ইন্দ্রিয়-

সুখ হইতে বিরত থাকে এবং সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়া ও জ্ঞান দান দিয়া সময় অতিবাহিত করে। এইরূপে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স কাটাইয়া, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে ও জীবনের অবশিষ্টাংশ সুখসচ্ছন্দে যাপন করে। তখন তাহারা চিক্কণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান করে এবং অঙ্গুলিতে ও কর্ণেও স্বর্ণাভরণ ধারণ করে। মাংস খায়, কিন্তু শ্রমসহায় জীবের নহে; এবং অধিকসংখ্যক সন্তানের আশায় যত ইচ্ছা তত বিবাহ করে।

পাঠকগণ দেখিবেন যে মেগাস্থিনিস্ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণদিগকেই অধিকতর শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া জানিতেন। ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ এই দুই আশ্রমের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই। যে ব্যক্তি সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিল, সে যে পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া নগরবহিঃস্থ উপবন আশ্রয় করিবে, তিনি এতদূর অনুসন্ধান রাখিতেন না। আর সকলেই যে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিত এরূপ বোধ হয় না। মনুর ব্যবস্থানুসারে ছত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের শেষ সীমা। ইহাকে মেগাস্থিনিস সাধারণ নিয়ম ভাবিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস বলেন যে ব্রাহ্মণেরা এই ভাবিয়া স্ত্রীলোকদিগকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করিত না যে পাছে তাহারা গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করে, বা জ্ঞানলাভ করিয়া পরাধীন থাকিতে না চায়। মৃত্যুসম্বন্ধে তাহারা সর্ব্বদা কথোপকথন করিত। তাহাদিগের মতে এ জীবন গর্ভাবস্থা তুল্য এবং মৃত্যু তত্ত্ববিদ্দিগের পক্ষে প্রকৃত ও সুখময় জীবনপ্রাপ্তিরূপ জন্ম। তাহাদিগের বিবেচনায় যাহা কিছু মানুষের ঘটে ভাল বা মন্দ নহে, অন্যরূপ ভাবা স্বপ্নবৎ মায়া, কারণ একই পদার্থ হইতে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং এক ব্যক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্ভূত হয়। নৈসর্গিক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদিগের গ্রীক্‌দিগের ন্যায় মত দেখা যায়। তাহারা বলে যে জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে, ইহার আকার গোল এবং যে ঈশ্বর ইহার স্রষ্টা ও পাতা তিনি ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। তাহাদিগের মতে বিশ্বমণ্ডলে অনেক ভূতের কার্য্য লক্ষিত হয়, এবং জল দ্বারা জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল। চারিভূতে তাহারা আর একটি ভূত (অর্থাৎ আকাশ) যোগ করে, উহা হইতেই স্বর্গ ও তারকারাজী নির্ম্মিত। আত্মার উৎপত্তি ও প্রকৃতি এবং অন্যান্য অনেক বিষয় সম্বন্ধে,

তাহাদিগের মত গ্রীক্‌দিগের সদৃশ। আত্মার অমরতা, ভবিষ্যৎ বিচার এবং ঈদৃশ বিষয়ে তাহারা প্লেটোর ন্যায় আপনাদিগের মত গল্পচ্ছটায় নিবদ্ধ রাখে।

শ্রমণদিগকে মেগাস্থিনিস্ দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। একদল বনে বাস করিত, পত্র ও ফল আহার করিত, বাকল পরিত, মদ্য ও ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বিরত থাকিত। কোন বিষয়ের কারণ জানিতে ইচ্ছা হইলে রাজারা তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইত। অন্যদল ভিষক্। তাহারা যদিও বনবাসী নহে, তথাপি মিতাচারী। তাহাদিগের খাদ্য ভাত বা যবের মণ্ড, উহা যেখানে চায় অথবা যেখানে অতিথি হয়, সেই খানেই পায়। তাহাদিগের ঔষধের গুণে লোকের সন্তান হয়; এমন কি, পুত্র কি কন্যা হইবে, তাহাও স্থির হয়। তাহারা ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের নিয়ম করিয়া রোগ আরাম করে। তাহারা তৈল ও প্রলেপকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করে।

প্রথম দলের শ্রমণদিগের আচরণ বানপ্রস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে, ইহাতে বোধ হইতে পারে যে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে আচারগত কোনরূপ বিশেষ বৈলক্ষণ্য ছিল না, অথবা মেগাস্থিনিস উভয়ের বিভেদ ভাল করিয়া জানিতেন না। শ্রমণ ভিষক্‌গণ যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন, অদ্যাপি ভারতবর্ষে সেই প্রণালীই চলিতেছে। ইহাতে অনুমান হয় যে প্রচলিত চিকিৎসাপ্রণালী চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্ব্বে এতদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস যাদৃশ দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে বেদান্তের আভাস স্পষ্ট প্রতীত হয়।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষবাসীদিগকে যে সাতশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কৃষকেরা দ্বিতীয়শ্রেণী। দেশের অধিকাংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ধীর ও নম্রস্বভাব। ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। যুদ্ধকালেও ইহাদিগের চাষের ব্যাঘাত হয় না। যেখানে দুইদলে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, তাহার নিকটেই কৃষকদিগকে নিরাপদে ভূমি কর্ষণ করিতে দেখা যায়। রাজাই ভূস্বামী, কৃষকেরা উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ পায়।

তৃতীয় শ্রেণী গোপাল ও শিকারী। ইহারা শিকার করে, পশুপালন করে, পশু বিক্রয় করে ইত্যাদি। ইহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। চতুর্থশ্রেণী কারুকর ও বাণিজ্যব্যবসায়ী। ইহাদিগের রাজকর দিতে হয়। কিন্তু যাহারা

যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ নির্ম্মাণ করে, তাহারা রাজার নিকট হইতে বেতন পায়। পঞ্চম শ্রেণী যোদ্ধা। ইহারা সংখ্যায় কেবল কৃষকদিগের অপেক্ষা কম। রাজকোষ হইতে ইহাদের ভরণপোষণ হয়, এবং যুদ্ধের উপকরণ ইহারা রাজসংসার হইতে পায়। এজন্য যখন আবশ্যক হয়, তখনই ইহারা সমরাঙ্গনে নামিতে প্রস্তুত। শান্তির সময়ে তাহারা সুরাপানাদি করিয়া আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে। ষষ্ঠ শ্রেণী চর, ইহারা সকল বিষয়ে রাজাকে গোপনে সংবাদ দেয়। সপ্তম শ্রেণী মন্ত্রিবর্গ। বিচারাসন, রাজকীয় উচ্চ উচ্চ পদ, এবং সাধারণ শাসনকার্য্য ইহাদিগের হস্তে; এবং ইহাদিগের দ্বারাই শাসনকর্ত্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনানী প্রভৃতি নির্ব্বাচিত হয়। এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের বিবাহ হয় না। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না, বা অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারে।

এই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়া বোধ হয় যে ব্যবসায়ের সহিত জাতির প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া মেগাস্থিনিস কয়েকটী ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণদিগকে ও জাতিভেদরহিত শ্রমণদিগকে এক তত্ত্ববিৎশ্রেণীতে স্থান দিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বজাতীয় লোক শ্রমণ হইতে পারিত বলিয়া যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে চর ও মন্ত্রিবর্গ ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত। জ্ঞানচর্চ্চা তাহাদিগের ব্যবসায় নহে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণদলের লোক বলিয়া জানিতে পারেন নাই। এই কয়েকটী ভ্রম সংশোধন করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে মনু হিন্দুসমাজের যেরূপ শ্রেণীবন্ধনের বর্ণনা করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের সময়ে প্রায় সেই রূপই ছিল। কৃষকেরা শূদ্র; কারুকর ও ব্যবসায়ীরা বৈশ্য; যোদ্ধারা ক্ষত্রিয়; চর, মন্ত্রিবর্গ ও তত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ, শিকারীরা চণ্ডালাদি নীচজাতি। মেগাস্থিনিস্ চমৎকৃত হইয়া লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষবাসীরা সকলেই স্বাধীন, কেহই দাস নহে।* ইহাতে বোধ হয় যে মনুর সময়ে শূদ্রদিগের যে প্রকার অবস্থা ছিল, মেগাস্থিনিসের সময়ে তাহার অনেক

---

* Arrian's India Sec. X.

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। অন্যজাতির দাসত্ব করা আর তাহাদিগের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় তাহারা কৃষকশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল।

মেগাস্থিনিস এতদ্দেশীয় লোকদিগকে কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা একখানি নিম্নবাস পরিতেন, উহা হাঁটুর নীচে কিছুদূর পর্য্যন্ত পড়িত; এবং আর একখানি উত্তরীয় কতক কাঁধে ফেলিতেন, কতক মাথায় জড়াইতেন। আমাদের বর্ত্তমান ধুতিচাদর এই পোষাক বলিলেই হয়; তবে কি না আমরা চাদর হইতে মাথাটা ছাড়াইয়া লইয়াছি, এবং প্রয়োজন মত অন্যরূপ শিরস্ত্রাণ এবং কাটা কাপড় পরিতে শিখিয়াছি।

কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময়েও যাহাদিগের অবস্থা ভাল ছিল, তাহাদিগের পোষাকের জাঁকজমক ছিল। লিখিত আছে, তাহারা বেশভূষা ভালবাসে। তাহাদিগের পোষাক স্বর্ণজড়িত ও মণিমাণিক্য রচিত, এবং তাহারা সুচিকণ ফুলকাটা বস্ত্র পরিধান করে। অনুগমনকারী অনুচরবর্গ তাহাদিগের মস্তকের উপর ছত্রধারণ করে; কারণ তাহারা সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত আদর করে, এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পায়।

রুচিভেদে তাহারা দাড়ির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রং করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেই আতপত্র ব্যবহার করিত। তাহারা শ্বেতচর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিত; পাদুকাগুলি চিত্র বিচিত্র ও উচ্চখুরবিশিষ্ট ছিল। *

সাধারণ লোকে উষ্ট্রে, অশ্বে ও গর্দ্দভে চড়িত; রাজা এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোকে হস্তীতে আরোহণ করিত। বাহনের মধ্যে গজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত; তাহার নীচে চতুরশ্বযুক্ত রথ; তৎপরে উষ্ট্র; এবং একাশ্বযানে চড়া কোনরূপ সম্ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হইত না। † বর্ত্তমান এক্কা বোধ হয় এই একাশ্বযানের প্রতিনিধি।

মেগাস্থিনিসের সময়ে ভারতবর্ষীয় পদাতিগণ সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার করিত। ধনুক মানুষসমান এবং বাণ প্রায় তিন গজ লম্বা। মাটীতে ধনুক স্থাপন করিয়া বামপদদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া তাহারা বাণত্যাগ করিত,—এবং

---

* Arrian's Indica Sec. XVI.

† Arrian's Indica Sec. XVI.

এমন কোনরূপ ঢাল বা কবচ ছিল না যাহা সে বাণে ভিন্ন হইত না। পদাতি-দিগের বামহস্তে গোচর্ম্মের ঢাল থাকিত। কেহ কেহ ধনুকের পরিবর্ত্তে বর্শা ব্যবহার করিত, কিন্তু সকলেই অসিধারণ করিত। অসি তিনহাতের অধিক লম্বা হইত না, এবং অত্যন্ত কাছাকাছি যুদ্ধ করিতে হইলে উহা দ্বিহস্তদ্বারা সঞ্চালিত হইত। অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ চর্ম্ম ও দুই গাছ বর্শা ব্যবহার করিত। তাহাদিগের জিন ছিল না। লৌহ বা পিত্তলের কাঁটাবিশিষ্ট লাগামদ্বারা অশ্বসঞ্চালনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।* রথে সারথি ছাড়া দুইজন রথী থাকিত, এবং মাতঙ্গে মাহুত ছাড়া তিনজন যোদ্ধা থাকিত।

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদিগকে মিতাচারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদিগের সচরাচর খাদ্য ভাত, যজ্ঞ ভিন্ন তাহারা মদ্য ব্যবহার করিত না। চৌর্য্য তাহাদিগের মধ্যে অল্পই হইত। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারিলক্ষ লোক ছিল, কিন্তু প্রতিদিন তথায় দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকে মামলা মোকদ্দমা কদাচ করিত। দলিল বা সাক্ষী না রাখিয়া কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অন্যের নিকটে কিছু বন্ধক বা গচ্ছিত রাখিতে সঙ্কুচিত হইত না। তাহারা সচরাচর গৃহ ও সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিত। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের আদর করিত। এজন্য বৃদ্ধলোক জ্ঞানী না হইলে কোন বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইত না। তাহারা অনেক স্ত্রী ক্রয় করিয়া বিবাহ করিত, কাহাকে ধর্ম্মপত্নী এবং কাহাকে কামপত্নী করিত। কোন পণ না দিয়া বা না লইয়াও অনেকে বিবাহ করিত; এরূপ স্থলে পিতা কন্যাকে সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিতেন, এবং যে ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে বা অন্য কোনরূপ শক্তি প্রকাশ কার্য্যে বিজয়ী হইতেন, তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন।† ইহা আমা-দিগের দেশের পুরাতন স্বয়ংবর। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে এদেশে লিখিত আইন ছিল না। বোধ হয় এতদ্দেশীয় ব্যবস্থা গ্রন্থের নাম স্মৃতি শুনিয়া তাঁহার এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল।

রাজা যুদ্ধের সময়ে এবং বিচারকালে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতেন; এবং বিচার করিতে গিয়া তিনি সারাদিন বিচারালয়ে থাকিতেন।

---

* Arrian's Indica Sec. XVI.

† Arrian's Indica Sec. XVII.

এতদ্ভিন্ন যজ্ঞ ও মৃগয়া করিতেও তিনি বাহির হইতেন। রাজার শরীররক্ষিণী রমণীদল ছিল; মৃগয়াকালে তাহারা তাঁহাকে ঘেরিয়া যাইত। শরীররক্ষিণীরা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উঠিত; এবং রাজা হস্তীতে চড়িয়া যাইতেন।

দুইটী দেবতার উপাসনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায়, সমতল প্রদেশে বিশেষতঃ মথুরার নিকটে হিরাক্লিসের, এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে দিওনিসুসের। হিরাক্লিস বোধ হয় আমাদিগের অদ্ভুতকীর্ত্তিশালী কৃষ্ণ, এবং দিওনিসুস প্রমত্ত মহাদেব।

কার্য্যকারণসম্বন্ধ। *
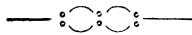
সমুদায় বিশ্বব্যাপারই কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত। সূর্য্য তাপ দিতেছে; মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে; অগ্নি দহিতেছে; মারুতহিল্লোলে লতাপল্লব সঞ্চালিত হইতেছে; ইত্যাদি যাহা কিছু জগন্মণ্ডলে ঘটিতেছে, সে সকলই কার্য্যকারণের দৃষ্টান্তস্থল। তাপ, বৃষ্টি, দাহন, লতাপল্লবসঞ্চালন প্রভৃতিকে কার্য্য, এবং সূর্য্য, মেঘ, অগ্নি, মারুতহিল্লোল প্রভৃতিকে যথাক্রমে তাহাদিগের কারণ বলিলে কি বুঝায়, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবেচ্য।

যাহার উৎপত্তি আছে, তাহাকেই কার্য্য বলা যায়। অনেক পদার্থ রাত্রিকালে শীতল থাকিয়া দিবসে সূর্য্যকিরণসংযোগে তাপযুক্ত হয়। বৃষ্টি এক সময়ে নাই, অপর সময়ে হইতেছে। কোন বস্তুতে অগ্নি সংস্পর্শ না হইলে, তাহা দগ্ধ হয় না। লতাপল্লব এক সময়ে স্থির হইয়া আছে, অপর সময়ে মারুতহিল্লোলে দুলিতেছে। অতএব তাপ, বৃষ্টি, দাহন, লতাপল্লবসঞ্চালন,

---

* বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮৪।

ইহাদিগের উৎপত্তি আছে; এজন্যই ইহারা কার্য্যপদবাচ্য। এইরূপ দিবারাত্রি, জীবোদ্ভিদ, সুখদুঃখ ইহাদিগের উদয় আছে বলিয়া, ইহারাও কার্য্য। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কাল কখন ছিল না ইহা কেহ কল্পনা করিতেও পারে না; সুতরাং ইহাদিগকে কার্য্য জ্ঞান করিতে বুদ্ধিমান্ মনুষ্যমাত্রেই অশক্ত। যাহা অনাদি, অথবা যাহার আদি আছে এরূপ প্রমাণ নাই, তাহাকে কার্য্য বিবেচনা করিতে আমাদিগের অধিকার নাই; যাঁহারা জগৎস্রষ্টার স্রষ্টা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যেন এই কথাটী মনে করিয়া রাখেন।

যাহা ব্যতিরেকে যে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তাহাকে সেই কার্য্যের কারণ বলে। সূর্য্য ব্যতিরেকে দিবাভাগের তাপ জন্মে না। বিনা মেঘে বৃষ্টি হয় না। অগ্নি বিনা দাহন ঘটে না। মারুতহিল্লোল ব্যতিরেকে লতাপল্লব সঞ্চালিত হয় না। এই নিমিত্তই সূর্য্যকে তাপের কারণ, মেঘকে বৃষ্টির কারণ, অগ্নিকে দাহনের কারণ, এবং মারুতহিল্লোলকে লতাপল্লবসঞ্চালনের কারণ বলা যায়।

যে সমুদায় ঘটনা, অবস্থা বা বস্তু সমবেত না হইলে কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয় না, কারণ বলিলে বিজ্ঞানানুসারে সে সমুদায়ের সমষ্টিকে বুঝায়; কিন্তু চলিত কথায় তন্মধ্যস্থ যে কোন একটীকে কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায়। যখন আমরা মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলি, তখন যে আমরা কারণাংশমাত্রের প্রতি লক্ষ্য করি, কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই অনুভূত হইবে। যে বাষ্পরাশি মেঘরূপে গগনমণ্ডলে ভাসমান হয়, তাহা শীতলবায়ুসংস্পৃষ্ট বা কিয়ৎপরিমাণে তাড়িতভ্রষ্ট না হইলে জলরূপে পরিণত হয় না। সুতরাং মেঘের শীতলসমীরণ-সংস্পর্শ বা তাড়িতত্যাগ বৃষ্টির অন্যতর কারণ। আবার ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, জলদ রূপান্তরিত হইয়া যে বারি জন্মে, তাহা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে পারিত না। সুতরাং ভূমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ বৃষ্টির আর একটী কারণ। অতএব প্রকৃতরূপে বৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মেঘ, তৎসঙ্গে শীতল বায়ুর সংস্পর্শ বা তৎকর্ত্তৃক তাড়িতত্যাগ, এবং পৃথিবীর মাধ্যা-কর্ষণ, এই কয়েকটীর উল্লেখ করিতে হয়।

কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি। সুতরাং কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। অগ্রে মেঘ হইবে, পরে বৃষ্টি হইবে। অগ্রে সূর্য্যোদয় হইবে, পরে পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ পদার্থচয় উত্তপ্ত হইবে। কিন্তু যাহা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী লক্ষিত হয়, তাহাই কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। যে সময়ে কুম্ভকার ঘট

গড়িতেছে, তৎপূর্ব্বক্ষণে কত জীবের জন্ম বা মৃত্যু, কত বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম বা বিনাশসাধন, কত রাজ্যের উদয় বা বিলয়, কত লোকের সম্পদ্ বা বিপদ্, কত গ্রহনক্ষত্রধূমকেতুর আবির্ভাব বা তিরোভাব হইতেছে। কিন্তু এ সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত ঘটের কোন সম্বন্ধ নাই। এ সমুদায় বিদ্যমান থাকিলেও মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ড ও কুম্ভকারের অভাবে ঘটের উৎপত্তি হইবে না; এবং এ সমুদায়ের অবিদ্যমানতাসত্ত্বেও মৃত্তিকা, চক্র, দণ্ড ও কুম্ভকার থাকিলে, ঘটোৎপত্তি হইতে পারিবে।

অসম্বদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার কারণত্বকল্পনাই, বোধ হয়, অনেক কুসংস্কারের মূল। এতদ্দেশীয় পুরাতন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা বৃক্ষরোপণ, গৃহ নির্ম্মাণ, কূপ খনন, প্রভৃতি সামান্য ঘটনাকেও তৎপরবর্ত্তী বিপদের কারণ, জ্ঞান করিয়া থাকেন। বার বা তিথিবিশেষে যাত্রা করিয়া অথবা দ্রব্যবিশেষ ভক্ষণ করিয়া কোনরূপ অমঙ্গল বা বিঘ্ন ঘটিলে পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ যে সমুদায় দোষ বার বা তিথির সম্বন্ধেই চাপাইবেন, বিচিত্র কি? অমুক দিন ব্যারাম হইলে, বিষম সঙ্কট; অমুক মাসে বিবাহ হইলে, অমুক দোষ ঘটে; অমুক সময়ে অমুক কার্য্য নিষিদ্ধ; ইত্যাকার এতদ্দেশে যে অসংখ্য ফলিতজ্যোতিষিক বচন প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অনেকগুলিই অমূলক কার্য্যকারণাশঙ্কাসম্ভূত বলিয়া প্রতীতি হয়। যে সকল কার্য্যের কারণনির্ণয় বহুদর্শনসাপেক্ষ, তদ্বিষয়েই অবৈধ সংস্কারের প্রবলতা দৃষ্ট হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কারণ নিরূপণ করা সহজ নহে; যদি এরূপ দুর্ঘটনার পূর্ব্বে কোন দেশে অপরিজ্ঞাতশক্তি ধূমকেতুর উদয় হইয়া থাকে, সে দেশবাসীরা অজ্ঞানতা নিবন্ধন যে তাহাকেই পূর্ব্ববর্ত্তী দেখিয়া কারণ বলিয়া স্থির করিবে, আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইউরোপ খণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিয়া বিশ্বাস হয়, বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে ঈদৃশ কুসংস্কারসকল সভ্য সমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

অসম্বদ্ধ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনানিচয় হইতে কারণের প্রভেদ প্রদর্শনার্থে দর্শনবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কুম্ভকার, চক্র, দণ্ড ও মৃত্তিকা সর্ব্বদাই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী; কখনই তাহাদিগের অভাবে ঘটোৎপত্তি হয় না, এবং যখনই তাহাদিগের সমাবেশ হয়, তখনই ঘটোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তীকে কারণ বলিলে, তৎসম্বন্ধে দুইটী আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথমতঃ একটী কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন কারণ লক্ষিত

হয়। সূর্য্যালোকে, অগ্নিসংযোগে, গতিনিরোধে, তাড়িতসঞ্চালনে, বা রাসায়নিকযোগে তাপ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বার্দ্ধক্যে, বিষপানে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রোগে, বা শারীরিক আঘাতে, লোকের মৃত্যু হয়। সুতরাং এতাদৃশ স্থলে কোন একটী ঘটনা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী না থাকিলেও কারণ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাও স্থলবিশেষে কারণপদবাচ্য নহে। দিবা রাত্রির নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, এবং রাত্রিও দিবার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী। তথাপি একটি অপরটীর কারণ নহে।

প্রথম আপত্তির খণ্ডনার্থে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী কথা বলা যাইতে পারে।—

১। কোন ঘটনার কারণ, বহুবিধ হইলেও, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক; এবং তন্মধ্যে একটা না একটা নিয়তই পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে। সুতরাং কারণের বহুত্ব নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিত্বের বাধক নহে।

২। যে যে স্থলে কারণের বহুত্ব প্রতীয়মান হয়, সেই সেই স্থলে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে প্রায়ই একত্ব লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাপ উৎপন্ন হইলেও, একমাত্র আণবিক গতিই যে তাহার অব্যবহিত কারণ, ইহা সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ টিণ্ডাল সাহেব সপ্রমাণ করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মৃত্যু সংঘটিত হইলেও, মস্তিষ্কের অংশ বিশেষের বিকার যে তাহার অব্যবহিত কারণ, শারীরতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ প্রতীতি জন্মে।

৩। একটী কার্য্যের যত প্রকার কারণ থাকুক না কেন, তন্মধ্যে যে কোন প্রকার কারণের সমাগম হইলেই নিয়ত প্রাগুক্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধেও বিবেচনা করিয়া দেখ, যদিও এক্ষণে দিবা রাত্রির নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, রাত্রিও দিবার নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, তথাপি সূর্য্যের তেজ বিলুপ্ত হইলে অথবা পৃথিবীর আহ্নিক গতি রুদ্ধ হইলে, দিবারাত্রির পরস্পর নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ পূর্ব্ববর্ত্তিতা নিয়তপদবাচ্য নহে। অন্যনিরপেক্ষ হইয়া যাহা সর্ব্বাবস্থায় পূর্ব্ববর্ত্তী থাকে, তাহাই প্রকৃত নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যে প্রকার বিচার করা গেল, তাহাতে একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল যে যাহা নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিয়া নিয়ত কার্য্যবিশেষ উৎপাদন করে, তাহাই উক্ত কার্য্যের

কারণ।* এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগেরও এই মত। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে,

"অন্যথাসিদ্ধশূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতাং কারণত্বং।"

যাহার অভাবে কার্য্য সিদ্ধ হয় না, তাহার নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কারণত্ব।

বৈশেষিক সূত্রকার লিখিয়াছেন,

"কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ।" ১। ২। আহ্নিক। ১ অধ্যায়।

কারণের অভাব হইলেই কার্য্যের অভাব হয়।

কারণের যিনি যাহা লক্ষণ করুন, এই সূত্রটীই তাহার প্রতি গ্রন্থিতে থাকিবে; এবং এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই উত্তরকালবর্ত্তী পণ্ডিতেরা কারণ নির্ণয়ার্থে অগ্রসর হন।

নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা দুইটী নিয়মের উল্লেখ করেন।

১। "যদভাবেন ইতরকারণসমুদয়সত্ত্বে যস্য উৎপত্তিং পশ্যতি তৎকার্য্যং প্রতি তস্য অকারণত্বং নিশ্চিনোতি।"

যাহার অভাবে ইতরকারণসমুদয়সত্ত্বে যাহার উৎপত্তি দেখিবে, তৎকার্য্য সম্বন্ধে তাহার অকারণত্ব জানিবে।

২। "যদ্ব্যতিরেকেণ ইতরকারণসমুদয়সত্ত্বে যস্য অভাবং পশ্যতি তৎকার্য্যং প্রতি তস্য কারণত্বং নিশ্চিনোতি।"

যদ্ব্যতিরেকে ইতরকারণসমুদয়সত্ত্বে যাহার অভাব দেখিবে, তৎকার্য্যসম্বন্ধে তাহার কারণত্ব জানিবে।

প্রথম নিয়মটি কারণাতিরিক্ত পদার্থবর্জ্জনের অমোঘ অস্ত্র; দ্বিতীয় নিয়মটী কারণনিরূপণের প্রধান সাধন। †

* We may define, therefore, the cause of a phenomenon, to be the antecedent, or the concurrence of antecedents, on which it is invariably and unconditionally consequent.

Mill's Logic.

† Compare the 2nd rule with Mill's 2nd and 3rd Cannons of Induction, the simple and compound methods of difference; and see the application of the 1st rule in Lewes's Physiology of Common life, where

আমাদিগের দেশে যে সকল দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত আছে তন্মধ্যে ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত ও বৌদ্ধ, এই কয়েকটী প্রধান। * কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া তাহাদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, সৎকারণ হইতে অসৎকার্য্যের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, সৎ হইতেই সতের আবির্ভাব ঘটে। বৈদান্তিকদিগের মতে, সমুদায় কার্য্যই একমাত্র সতের বিবর্ত্ত। বৌদ্ধদিগের বোধে, অসৎ হইতে সৎ জন্মে। এই সকল মতের উল্লেখ করিয়াই বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন।—

"কেচিদাহুরসতঃ সজ্জায়ত ইতি একস্য সতোবিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সদিত্যপরে। অন্যে তু সতোঽসজ্জায়তইতি সতঃ সজ্জায়তে ইতি বৃদ্ধাঃ।"

কেহ কেহ কহেন, অসৎ হইতে সৎ জন্মে (বৌদ্ধ); অপরে বলেন কার্য্যজাত একমাত্র সতের বিবর্ত্ত, কোন বস্তুই সৎ নহে (বৈদান্তিক) অন্যে কিন্তু কহেন, সৎ হইতে অসৎ জন্মে (নৈয়ায়িক); বৃদ্ধেরা বলেন. সৎ হইতে সৎ জন্মে (সাংখ্য)।

আমরা দেখাইব যে এ সকল মতই সত্য; ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকারেরা সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ দেখিয়া অপরকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিয়াছেন। কথিত আছে যে কয়েকজন অন্ধ হস্তী প্রত্যক্ষ করিতে গিয়াছিল। কেহ পদ, কেহ শুণ্ড, কেহ কর্ণ, কেহ উদর, স্পর্শ করিল; পরে যখন পরস্পরের অর্জ্জিত জ্ঞানের আলোচনা করিতে বসিল, তাহাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। যে পদ স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল যে হাতি গাছের গুঁড়ির মত। যে শুণ্ড স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল সাপের মত। যে কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল কুলার মত। যে উদর স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল ঢাকের মত। কেহ স্বীয় প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া অন্যের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং বিবাদভঞ্জনও হয় না। পরিশেষে, একজন চক্ষুবিশিষ্ট পথিক

---

he lays down that the persistence of a function after the destruction of an organ shews its independence of that organ.

* ন্যায় বলিতে অক্ষপাদ ও বৈশেষিক, সাংখ্য বলিতে কাপিল ও পাতঞ্জল, বেদান্ত বলিতে উত্তর মীমাংসা বুঝায়। মতভেদসত্ত্বেও ইহারা বেদ মানে বলিয়া হিন্দুসমাজে আদরণীয়। বৌদ্ধেরা বেদকে অভ্রান্ত বিবেচনা করে না; কিন্তু এক সময়ে তাহারাই এতদ্দেশে প্রবল ছিল।

কলহের কারণ শুনিয়া বলিল, তোমরা সকলেই সত্য কথা কহিতেছ; হাতির পা গাছের গুঁড়ির মত, হাতির শুঁড় সাপের মত, হাতির কাণ কুলার মত ও তাহার উদর ঢাকের মত; তোমরা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছ; সমুদায় হস্তীটি প্রত্যক্ষ কর নাই বলিয়া অন্যকে ভ্রান্ত ভাবিতেছ।' উক্ত পথিকের ন্যায় আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব যে সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দর্শন করিয়াই দার্শনিকেরা কার্য্যকারণ বিষয়ে পরস্পরকে ভ্রান্ত ভাবিয়াছেন।

নৈয়ায়িকেরা বলেন কারণ তিন প্রকার, সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। * যাহা সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। ঘটের সমবায়িকারণ কপালদ্বয়; পটের সমবায়িকারণ তন্তুনিচয়। কার্য্যোৎপাদনার্থে সমবায়িকারণের যে সংযোগ ঘটে, তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ; তন্তুনিচয়ের সংযোগ পটের অসমবায়িকারণ। সমবায়ী ও অসমবায়ী ব্যতিরিক্ত অন্যকারণের নাম নিমিত্ত কারণ। † কুম্ভকার, চক্র ও দণ্ড ঘটের নিমিত্ত কারণ; তন্তুবায়, তন্ত্র ও তুরি ‡ পটের নিমিত্ত কারণ। কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, কার্য্য যে উপাদানে নির্ম্মিত তাহাই নৈয়ায়িকদিগের সমবায়িকারণ; কার্য্য যে শক্তিসাপেক্ষ তাহাই নিমিত্তকারণ; এবং কার্য্যোৎপত্তি জন্য উক্ত উপাদান ও শক্তির যেরূপ সংযোগ আবশ্যক তাহাই, অসমবায়িকারণ। কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যটী থাকে না; কিন্তু যে শক্তি প্রভাবে ও উপাদানসংযোগে কার্য্যটী উৎপন্ন হয়, সে শক্তি ও সে উপাদান থাকে। এই নিমিত্তই নৈয়ায়িকেরা কহেন যে সৎ কারণ হইতে অসৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। ¶

---

* Compare with the Material, the Formal and the Efficient causes of Aristotle.

† ন্যায়পদার্থতত্ত্ব নামক গ্রন্থ দেখ।

‡ মাকু।

¶ ঘটের পূর্ব্বে কুম্ভকার, দণ্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি থাকে; পটের পূর্ব্বে তন্তুবায়, তন্ত্র, তন্তু প্রভৃতি থাকে।

সাংখ্যমতাবলম্বীরা কার্য্যকে অসৎ বলিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন,

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

ভগবদ্গীতা।

অসৎ হইতে সৎ হয় না, সৎ হইতে অসৎ হয় না।

"নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ। ৭৮ সূত্র। ১ অধ্যায় কপিল সূত্র।

অবস্তু হইতে বস্তুসিদ্ধি হয় না।

"নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ।" ১১৪ সূত্র। ১ অধ্যায় কপিলসূত্র।

নৃশৃঙ্গবৎ অসতের উৎপত্তি হয় না।

তবে সৎকারণ হইতে কি প্রকারে অসৎকার্য্য হইবে? আমরা স্বীকার করিতেছি এবং বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে উৎপন্ন কার্য্যটী সত্তাযুক্ত অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট, নৃশৃঙ্গবৎ কল্পিত পদার্থ নহে; আর তদুৎপাদক উৎপাদন এবং শক্তিও পূর্ব্বে ছিল। এই অর্থেই সৎ হইতে সতের আবির্ভাব হয়, সাংখ্যবাদীদিগের এই মতটী অখণ্ডনীয়। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে তখন কার্য্যবিশেষের অস্তিত্ব থাকে না, তখন তৎপ্রতি অসৎ শব্দ প্রয়োগের দোষ কি? কপিলশিষ্যেরা অসম্ভব ও অবাস্তব এইরূপ অর্থেই অসৎ শব্দ ব্যবহার করেন। নৈয়ায়িকেরা প্রাগস্তিত্বশূন্য পদার্থকে অসৎ বলেন।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে, পদার্থপুঞ্জ যে সকল পরমাণুর সমষ্টি ও বিশ্বব্যাপারনিচয় যে সকল বলের কার্য্য তাহারা বর্দ্ধিত বা বিনষ্ট হয় না। একখানি কাষ্ঠ দগ্ধ কর; তদুৎপন্ন বাষ্প, অঙ্গার ও ভস্ম একত্রিত করিলে দেখিবে, তাহাদিগের ভার উক্ত কাষ্ঠখণ্ডের তুল্য। একটী গতিশীল পদার্থ আহত হইয়া নিশ্চল হউক; সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে অবগত হইবে যে, অন্তর্হিত গতি পরিমাণানুরূপ তাপরূপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে জগন্মণ্ডলস্থ উপাদান বা শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কেবল রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সাংখ্যমতাবলম্বীরা এই তত্ত্বটী বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। দুগ্ধ ও তিন্তিড়ীরস একত্রিত করিলে, এই উভয়ের পরিণামে দধি উৎপন্ন হইল। কপিলশিষ্যেরা বলিলেন যে, দুগ্ধও সৎ, তিন্তিড়ীরসও সৎ, এবং তদুভয়োৎপন্ন দধিও সৎ, অর্থাৎ কল্পিত পদার্থ নহে, অস্তিত্ব বিশিষ্ট।

বৌদ্ধেরা ভাবিলেন, যখন দধি উৎপন্ন হইল, তখন দুগ্ধ ও তিন্তিড়ী রস কোথায়? দধি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু দুগ্ধ ও তিন্তিড়ী রস ত নাই। সুতরাং সৎস্বরূপ দধি অসৎ দুগ্ধ ও তিন্তিড়ী রস হইতে উৎপন্ন হইল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অত্যল্প কাল হইল আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এক মাত্র শক্তি বিশ্বমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। গতি, তাপ, বিদ্যুৎ, আলোক, রাসায়নিক সম্বন্ধ, জীবন, চিন্তা, সকলই এক; সকলই জগৎ-নিহিত অপরিজ্ঞেয় মূল শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সমুজ্জ্বল শিশিরবিন্দু বা তিমিরবিনাশী প্রভাকরপ্রভা, ভীষণকল্লোলকোলাহলময়ী কল্লোলিনী বা সুমন্দমারুতান্দোলিত, বনস্পতি, রক্তসঞ্চালনসম্পন্ন সুন্দর জীবশরীর বা কল্পনারঞ্জিত বুদ্ধিবিভূষিত মানবমন সকলই একমাত্র কুহকীর ভোজ-বাজি। সে কুহকীর প্রকৃতি জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় কাণ্ডই তাহার লীলা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে বৈদান্তিকেরা এই গভীর তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সমুদায় কার্য্যকেই একমাত্র সতের বিবর্ত্ত জ্ঞান করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা "একমেবা-দ্বিতীয়ং" ধ্বনিত করিতেন। এই নিমিত্তই তাঁহারা প্রত্যক্ষগোচর পদার্থ সকলে "ব্যবহারিক" সত্তামাত্র আরোপ করিতেন, এবং কেবল জগৎকর্ত্তার "পারমার্থিক" সত্তা স্বীকার করিতেন।

মুণ্ডকোপনিষদে লিখিত আছে,

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং॥ ৭। ১ খণ্ড। ১ মুণ্ডক।"
"তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ॥
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি।১।১ খণ্ড। ২ মুণ্ডক।"

যেমন ঊর্ণনাভ আপনা হইতে সূত্রের সৃষ্টি করে ও পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি জন্মে, যেমন জীব শরীর হইতে কেশ লোমাদির উৎপত্তি হয়, তেমনই সমুদায় বিশ্ব অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে জন্মে।

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নির সমানরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় তেমনই সেই অবিনাশী ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার জীবন সকল উৎপন্ন হয় এবং পরে তাঁহাতেই লীন হয়।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

"সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ।
নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ।
সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ।
তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।"

তিনি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট, মূর্ত্তাশ্রয় অমূর্ত্তাশ্রয়, চেতন অচেতন, সত্য অনৃত, ও সৎ প্রভৃতি যাহা কিছু সমুদায় হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে সত্য কহে।

এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা লিখিত হইল তাহাতে এক প্রকার প্রদর্শিত হইল, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দার্শনিকদিগের মত কত দূর সত্য। এক্ষণে আমরা একটী প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

আমরা বলিয়াছি যে সমুদায় বিশ্বব্যাপারই কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত, অর্থাৎ জগন্মণ্ডলস্থ প্রত্যেক ঘটনারই এক একটী কারণ আছে। ইহার প্রমাণ কি?

ইহার প্রথম প্রমাণ এই যে, অনুসন্ধান দ্বারা অদ্যাপি কোথায়ও কার্য্যকারণনিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় নাই। পদতলস্থ ধূলিকণা হইতে গগনচর দুর্লক্ষ্য নক্ষত্রমালা পর্য্যন্ত যতদূর অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষিত বা পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে এবং জড়জগৎ, জীবাত্মা ও মনুষ্য-সমাজ সম্বন্ধে একাল পর্য্যন্ত যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বত্রই কার্য্যকারণসম্বন্ধ বিদ্যমান লক্ষিত হইয়াছে। কোন পরিজ্ঞাত স্থলেই বিনা কারণে কোন একটী ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় নাই।

এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, কারণ বিনা কোন ঘটনা ঘটিতে পারে, ইহা আমরা ভাবিতেও পারি না। আমরা ভাবিতে পারি যে, সূর্য্য আর উদিত হইবে না, চন্দ্র চূর্ণ হইয়া যাইবে, নক্ষত্রচয় নিষ্প্রভ হইবে, হস্তত্যক্ত প্রস্তরখণ্ড পৃথিবীতলে পতিত না হইয়া ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত হইবে; কিন্তু বিনা

কারণে যে এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনানিচয় ঘটিবে, ইহা আমরা ভাবিতে পারি না। আমরা এরূপ ভাবিতে পারি না, ইহাতে দেখাইতেছে যে, আমাদিগের প্রকৃতিগত একটি সংস্কার রহিয়াছে যে বিনা কারণে কোন ঘটনা ঘটিতে পারে না। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, ঈদৃশ সংস্কারের মূল এই যে, আমরা পুরুষানুক্রমে কখন এ নিয়মের ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করি নাই। সুতরাং ইহার অনুকূল প্রমাণাপেক্ষা প্রবলতর আর কিছু আমরা চাহিতে পারি না।

ভাষার উৎপত্তি।

ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত জীবের মধ্যে কেবল মনুষ্যই উন্নতিশীল। পুরাকালে যেরূপ কৌশলে পক্ষিগণ নীড় নির্ম্মাণ করিত, মধুমক্ষিকানিকর মধুচক্র রচনা করিত, ঊর্ণনাভ লূতাতন্তু জাল বিস্তার করিত, এক্ষণেও তদ্রূপ করিতেছে। কিন্তু কালে কালে মানব জাতির অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গিরিগহ্বর বা তরুশাখা যাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষনিচয়ের আশ্রয় ছিল, তাহারা ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস করিতেছে। বনের ফল বা অপক্ব মাংস যাহাদিগের আহার ছিল, যাহারা উলঙ্গ থাকিতে লজ্জা বোধ করিত না, যাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ পদে পদে প্রাকৃতিক কার্য্য পরম্পরায় ভয়ঙ্কর দৈব শক্তির লক্ষণ দেখিয়া ভীত হইত, তাহাদিগের বংশ-জাত সভ্যজাতিগণের কৃষি সমুৎপন্ন পরিপক্ব ভক্ষ্য দ্রব্যের পারিপাট্য, সুবিচিত্র বেশভূষার আড়ম্বর, নৈসর্গিক নিয়ম জ্ঞান জনিত পার্থিব প্রভুত্ব নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে ভাষাই এই অত্যাশ্চর্য্য উন্নতির মূলীভূত। ভাষার প্রভাবেই অর্জ্জিত জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। ভাষার প্রভাবেই উত্তর কালবর্ত্তী জনগণ পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া নূতন সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সুতরাং ভাষার প্রভাবেই পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়া মনুষ্যের ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং অবস্থার উন্নতি হয়।

ভাষাশক্তিগুণে মানব জাতির ঈদৃশ মহত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত ভাষাশক্তিকেই নরকুলের বিশেষ লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বাস্তবিক ভাষা না থাকিলে মনুষ্য পশুতে কি বিভেদ থাকিত? উপস্থিত পদার্থ পুঞ্জেই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। প্রত্যক্ষাতিরিক্ত তত্ত্বনিচয় হৃদয়ঙ্গম হইত না। সমীপস্থ ভোগ্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করাই জীবনের উদ্দেশ্য হইত। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নত ভাব সকল, মনে স্থান পাইত না। কবির রসময়ী কবিতা লহরী, দার্শনিকের পরমার্থ বিষয়ক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা, ইতিহাসের উদ্দীপক দৃষ্টান্তমালা, বিজ্ঞানের অকাট্য উপপত্তি, ধর্ম্মের গম্ভীর উপদেশ, প্রণয়ের অনন্ত আশা প্রকাশ, এই সকল মনুষ্য গৌরবসূচক সভ্যতাচিহ্ন কোথায় থাকিত?

এই মানব-মহিমা-প্রসূতি ভাষার কিরূপে উৎপত্তি হইল, আমরা এই প্রস্তাবে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। কি বাঙ্গালা, কি হিন্দি, কি সংস্কৃত, কি ইংরাজি, কি আরবি, কি পারসি, কোন ভাষা যখন ছিল না, মনুষ্যগণ কিরূপে আদৌ ভাষা শিক্ষা করিল, আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে যত্ন করিব। নরজাতির স্বভাব সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি, তাহার সাহায্যে অতীত কালের গাঢ় তিমির ভেদ করিয়া ভাষার প্রথম সঞ্চার বর্ণনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

মনোভাব ব্যঞ্জক পরিস্ফুট বর্ণময় শব্দমালার নাম ভাষা। এই লক্ষণের দ্বারা প্রথমতঃ অভিপ্রায় প্রকাশক অঙ্গভঙ্গিগুলি বাদ যাইতেছে। যে কথা কহিতে পারে না, যাহার শব্দের অকুলান আছে, বা যে দেশবিশেষের ভাষা না জানিয়া কার্য্যোপলক্ষে তথায় উপস্থিত হয়, দেহসঞ্চালনই তাহার প্রধান সম্বল। মূক, শিশু, অসভ্য বা ভাষানভিজ্ঞ পর্য্যটক, হাত পা মুখ প্রভৃতি নাড়িয়া কোনরূপে আপনার মনের বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু এবংবিধ শারীরিক ক্রিয়া সমুদায় ভাষাপদ বাচ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের লক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের পরিস্ফুট বর্ণাত্মক ভাষা অপর জীবগণের অস্ফুট শব্দ সমুহ হইতে বিভিন্ন বলিয়া গণ্য হইতেছে। অধিকাংশ জন্তুই যে শব্দ বিশেষ দ্বারা স্বজাতির মধ্যে সুখ দুঃখ ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগের শব্দগুলি পরিস্ফুট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করা যায় না; সেগুলি অপরিস্ফুট স্বর মাত্র। সত্য বটে, কোন কোন পাখীতে মানব ভাষার অনুকরণ

করিতে পারে; কিন্তু তাহাদিগের স্বাভাবিক ভাষা প্রায় অধিকাংশ অস্ফুট, অথবা একটী বাঁধা স্বর মাত্র।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী মত আছে, ১ম অপৌরুষেয়ত্ববাদ *, ২য় সম্মতিবাদ, ৩য় অনুকৃতিবাদ। আমরা যথাক্রমে এই তিনটীর পর্য্যালোচনা করিব।

অপৌরুষেয়ত্ববাদীরা বলেন যে, ভাষা মনুষ্য-নির্ম্মিত নহে, ঈশ্বর-প্রদত্ত। তাঁহাদিগের মতে সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, বাসনা, ইচ্ছা প্রভৃতি প্রকাশার্থে প্রথমসৃষ্ট নর-কুল-পিতা সুন্দর ভাষা-জ্ঞান-ভূষণে দেবাদিদেব জগৎপতি কর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ভূতকালের অন্ধকারময় গর্ভে জ্যোতির্ম্ময় সত্যযুগ নিরীক্ষণ করেন এবং যাঁহারা কাল সহকারে মানবজাতির বিদ্যা ও নীতি বিষয়ে অধোগতি সন্দর্শন করেন, তাঁহারা এই মতের প্রধান প্রতিপোষক। তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না যে জগৎ-কারণ যাহাকে ভূমণ্ডলের আধিপত্য প্রদানার্থে সৃজন করিলেন, সেই নবসৃষ্ট আদিপুরুষের কোন অভাব ছিল। শব্দানুকরণ-শক্তি-বিশিষ্ট অথচ ভাষা-বিবর্জ্জিত, বিজ্ঞান-শূন্য, নীতি-শূন্য, ধর্ম্ম-শূন্য, অসভ্যচূড়ামণিকে আদি পিতা বলিতে তাঁহাদের লজ্জা হয়; এজন্য সর্ব্বগুণবিশিষ্ট মনোহর মূর্ত্তি কল্পনা করেন; কিন্তু এরূপ কবির চিত্তে প্রত্যয় স্থাপন না করিয়া যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণার্থে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। দেখ, ইতিহাস পাঠে কি জানা যায়। মনুষ্যের ক্রমাগত অবনতি নহে, উত্তরোত্তর উন্নতি। কালক্রমে নরজাতির জ্ঞান ও নীতির বৃদ্ধি হইতেছে। সত্য বটে, কোন নির্দ্দিষ্ট-দেশ-বাসীদিগের প্রভাবের উদয়াস্ত আছে; যেমন তাহাদিগের এক সময়ে উন্নতি হইতেছে, তেমনই অপর সময়ে অবনতি হইতেছে; কিন্তু অনেক দিন ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে সমগ্র মানবজাতি ক্রমেই উন্নত হইতেছে, অবনত হইতেছে না। জোয়ার আরম্ভ হইলে যেমন অল্প ক্ষণের মধ্যে জল বৃদ্ধি বুঝা যায় না, বরং

* আমাদিগের দেশে যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভাবেন, বেদ মনুষ্য বিরচিত নহে, ঈশ্বর প্রণীত; কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে বেদ নিত্য; কাহারও রচিত নহে। শেষোক্ত মতে ভাষার নিত্যতা কল্পিত হইতেছে; কিন্তু এমতটী এরূপ অসঙ্গত যে, ইহার বিষয়ে কিছু লেখা আবশ্যক বোধ হইল না।

ভাটাই হইতেছে সন্দেহ থাকে, কিন্তু কিয়ংকাল পরে সলিলের উচ্চতা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়; তেমনই অল্প কালের মধ্যে মনুষ্য-জাতির উন্নতি নয়নগোচর না হইয়া অবনতি প্রতীয়মান হইলেও অধিক সময় ব্যবধানে দেখিলে উন্নতি অনুভূত হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভাষাও উন্নত হইতেছে। সভ্যতাজনিত নূতন ভাব প্রকাশার্থে নূতন শব্দ সৃষ্ট হইয়া ভাষার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে, অথবা পুরাতন শব্দ নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া ভাষার ভাব প্রকাশিকা শক্তি বিস্তার করিতেছে। সুতরাং ভাষা ঈশ্বরপ্রদত্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পদার্থ, সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট আদি-মানবের অনুপার্জ্জিত সম্পত্তি, এ মতটী ঐতিহাসিক-প্রমাণ বিরুদ্ধ। ইহার আরও অনেক দোষ আছে। আমাদিগের কি না ঈশ্বর-প্রদত্ত? কিন্তু ঈশ্বর শক্তি ও উপকরণ দিয়াই ক্ষান্ত হন। তিনি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন না; প্রস্তর, মৃত্তিকা, চূর্ণক প্রভৃতি বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করিবার ক্ষমতাও আমাদিগকে দিয়াছেন। সেইরূপ হয়ত তিনি আমাদিগকে শব্দানুকরণ ও শব্দ-সন্নিবেশ শক্তি দিয়া থাকিবেন। তদ্দ্বারাই যদি আমরা ভাষা প্রস্তুত করিতে পারি (পারি যে ইহার প্রমাণ পরে দেওয়া যাইবে), তবে ভাষা মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, ঈশ্বরপ্রদত্ত, কেন ভাবিব? এইরূপ বৃথা কল্পনা দ্বারা অনুসন্ধানের পথরুদ্ধ করা হয়, এই মাত্র। যাহা কিছু লোকে বুঝিতে পারে না, তাহাতেই ঈশ্বরকে আনিয়া ফেলে। ঝড়ে, বৃষ্টিতে, অগ্নিতে পূর্ব্বে ঈশ্বরের হস্ত দৃষ্ট হইত; কিন্তু বিজ্ঞান তাহাদিগকে প্রকৃতির নিয়মের অধীন করিয়াছে। যদি মানব বংশের আদি পুরুষ হাত, পা, নাক, কাণ, চোক প্রভৃতির ন্যায় ভাষাও পাইতেন, তাহা হইলে আর একটী বিপদ ঘটিত। যে ভাষা সম্পূর্ণ, তাহাতে প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক ভাবের এক একটী নাম চাই। যখন আদি পিতার প্রথম জ্ঞান হইল, সকল পদার্থ একেবারে তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল, বিশ্বাস করা যায় না; যদি না হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামগুলি কিরূপে তাঁহার স্মরণে রহিল, এবং স্থল বিশেষে তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রয়োগ করিতেই বা শিখি-লেন? ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া এক একবার সমুদায় বস্তুর নাম না বলিয়া দিলে, তাঁহার শব্দ-প্রয়োগ-জ্ঞান জন্মিবার আর কোন উপায় এই মতানু-সারে উদ্ভাবিত হয় না।

সম্মতিবাদ পক্ষাবলম্বীদিগের মতে কতকগুলি লোকে পূর্ব্বকালে একত্রিত হইয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিল যে এই এই পদার্থের এই এই নাম দেওয়া যাইবে। কিন্তু ভাষার সত্তাভাবে এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়? ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কিরূপে তাহারা পরস্পরের অভিপ্রায় জানিল? এ মতটী সুতরাং ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে খাটে না। অনেক লোক কেন একটী বস্তু বুঝাইতে একই শব্দ প্রয়োগ করে, ইহাই এমতের প্রধান প্রতিপাদ্য। কিন্তু ইহার প্রমাণ কোথায়? ইতিহাসে ত নাই। সঙ্কল্প বা সম্মতি ভাষা পরিবর্ত্তনে অতি অল্প কার্য্যই করিয়াছে। প্রতিযোগী শব্দ ও ভাষার দ্বন্দ্ব আমাদিগের সম্মুখেই চলিতেছে; এই মারাত্মক বিরোধে সম্মতি বা সন্ধি কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাহা স্বভাবতঃ মিষ্ট, যাহা বহুজনপরিগৃহীত, যাহা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, যাহা বল, ঐশ্বর্য্য বা ধর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট, যাহা পার্শ্ববর্ত্তী সভ্যতার উপযোগী, তাহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া জয়লাভ করে।

এক্ষণে আমরা অনুকৃতি বাদ প্রকটনে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই মতে কোন বস্তু হইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক চিত্তাবেগ বশতঃ আমাদিগকে মুখ হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ স্বর নিঃসৃত হয় সেইরূপ শব্দ বা স্বরের অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত প্লেটোর গ্রন্থে এই মতের প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। ইদানীন্তন কালীন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ফরাসীদেশীয় রিনান্ * এবং ইংলণ্ড নিবাসী ফ্যারার † এই মত সমর্থন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই মতের মূল কেবল দুইটী কথা। প্রথম মনুষ্যের শব্দানুকরণ শক্তি আছে, দ্বিতীয় বিস্ময় হর্ষ প্রভৃতি চিত্তাবেগ-বশতঃ মনুষ্যের মুখ দিয়া স্বভাবতঃ শব্দ বিশেষ বিনির্গত হয়। এই দুইটী যে সত্য, প্রতি দিনই জানিতে পারা যাইতেছে। অনুকরণশক্তি-প্রভাবেই আমরা ভাষা শিক্ষা করিতে পারিতেছি; অনুকরণ শক্তি থাকাতেই বিড়াল শব্দ শিখিবার পূর্ব্বে অনেক বালকে মার্জ্জারকে "ম্যাও ম্যাও" বলে। দুঃখ, ঘৃণা, চমক, আহ্লাদাদির আতিশয্য হইলে যে আপনা আপনিই আস্য হইতে

* Renan.
† Farrar.

শব্দ নিঃসৃত হয়, ইহাও কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আবেগ বাচক শব্দের যেরূপ সাদৃশ্য বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় দৃষ্ট হয়, তাহাও বোধ হয় এই স্বাভাবিক বেগের ফল।

অনুকৃতিবাদ মতে সুতরাং এইমাত্র অনুমিত হইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল শক্তি থাকাতে মানব জাতির ভাষা রক্ষা হইতেছে, সেই সকল শক্তি প্রভাবেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে যে শক্তি থাকাতে শিশুগণ মনুষ্যোচ্চারিত শব্দের অনুকরণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করে, এবং সময়ে সময়ে কথার অকুলান বশতঃ নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে, সেই শক্তি থাকাতেই আদিম পিতৃগণ পক্ষিগণের সঙ্গীত, অপর জীবের রব, জলের কল কল, পত্রের মর্ম্মর প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ করিয়া ভাষার মূল পত্তন করেন।

কখন এই অনুকৃতি শক্তি মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রথম বিকাশ পায়, আমরা অনুসন্ধান করিতে যাইব না। মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে পরিণামবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, নরকুলের পূর্ব্বপুরুষগণ ভাষাবিহীন পশুবৎ জীব হউন বা না হউন, তাহা আমাদিগের নির্ণয় করিবার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান মানব প্রকৃতিসুলভ শব্দানুকরণ শক্তি যাহার ছিল না, সে এ প্রবন্ধে মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি অনুকৃতিবাদই সত্য, তবে কেন সংস্কৃত বা ইংরাজী প্রভৃতি উন্নত ভাষাতে অনুকরণোৎপন্ন-লক্ষণ-যুক্ত শব্দ অধিক পরিমাণে দেখা যায় না? কেন আমরা ম্যাও ম্যাও না বলিয়া বিড়াল বা ক্যাট বলি, খ্যাও খ্যাও না বলিয়া সারমেয় বা ডগ্ বলি, ইত্যাদি? দ্বিতীয়তঃ কেনই বা বিবিধ ভাষার বহু বিস্তীর্ণ শব্দমালা স্বাভাবিক শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইয়া গুটিকতক ধাতু হইতে সমুৎপন্ন দৃষ্ট হয়? নিম্নে এবিষয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, ইহা মনে রাখা উচিত যে সংস্কৃত ও ইংরাজিতে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহাদিগকে স্পষ্টই অনুকরণোৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কাক ও ইংরাজি ক্রো, সংস্কৃত কোকিল ও ইংরাজি কুঁ কু, সংস্কৃত কুক্কুট ও ইংরাজি কক্, এই শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচ্য যে সংস্কৃত বা ইংরাজির ন্যায় সুন্দর-ভাব-প্রকাশক ভাষা পাইয়াও মনুষ্যের মন অদ্যাপি অনুকৃতির পক্ষপাতী আছে। যখন আলঙ্কারিকেরা বলেন যে যদ্রূপ ভাব,

তদ্রূপ শব্দ বিন্যাস করিবে, যখন উৎকৃষ্ট কবিগণ তদনুযায়ী কার্য্য করিতেও বিশেষ প্রয়াস পান, তখন বলিতে হইবে যে আমাদিগের অন্তঃকরণে একটী নিগূঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভাষার উদ্দেশ্য তখনই সর্ব্বাপেক্ষা সফল হয়, যখন বর্ণিত পদার্থের সহিত ব্যবহৃত পদের শব্দগত সাদৃশ্য থাকে। তৃতীয়তঃ, ইহাও দ্রষ্টব্য যে যদি কোন কথা বাস্তবিক অনুকৃতিজাত হয়, তাহা নির্ণয় করাও বড় কঠিন কাজ, কারণ অনুকরণোৎপন্ন হইলেও দেশভেদে নামগত অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য ঘটে। দেখ সংস্কৃত কলকল ও ইংরাজি মর্ম্মর, সংস্কৃত স্বন্ স্বন্ ও ইংরাজি হিংসিং, একই স্বাভাবিক শব্দের অনুকৃতি; কিন্তু তাহাদিগের রূপ কত ভিন্ন। প্রাকৃতিক শব্দ ও তৎপ্রকাশক কথার পরস্পর সম্বন্ধ অতি দূরবর্ত্তী ও কল্পনামূলক। যখন একটী পাখী ডাকিতেছে, সন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে তাহার স্বর ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লাগে। লোকের ইন্দ্রিয়বোধের তারতম্য আছে। উপস্থিত মনের গতিতে বহির্জগৎকে নূতন ভাব প্রদান করে। যে বিহঙ্গমরব এক সময়ে মধুর সঙ্গীত বোধ হইবে, অন্য সময়ে তাহাই আবার শোকসিক্ত হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি জ্ঞান হইবে। যে শব্দে ভাবুক ঐশ্বরিক গাম্ভীর্য্য দেখিবেন, সে শব্দ হয়ত বিরহী মদনোদ্দীপক ভাবিবেন। রঙ্গিল কাচের ন্যায় আমাদিগের মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বস্তু সমুদায়কে স্ববর্ণে আচ্ছাদিত করে; সুতরাং একই শব্দ যে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিয়া অনুকরণ করিবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। চতুর্থতঃ, অনুকৃতি-মূলক শব্দ যখন প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তখন উহা সম্ভবতঃ একটী বিশেষ পদার্থের নাম মাত্র ছিল; পরে তৎসদৃশ অপরাপর বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া ইহা জাতিনামরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যে সাদৃশ্য লইয়া ঈদৃশ অর্থবিস্তার ঘটে, তাহা শব্দগত না হইয়া আকার গত বা অন্য কোন কল্পিত লক্ষণগত হইতে পারে। এইরূপে কালক্রমে উহার প্রাকৃতিক শব্দমূলক অর্থ লুপ্ত হইবে, এবং উহা উক্ত জাতিগুণবাচক ধাতু বলিয়া গণ্য হইবে, আশ্চর্য্য নহে। কিরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিশেষ নাম সাধারণ নাম হইয়া পড়ে, সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। দেখ, তৈল শব্দের প্রকৃত অর্থ তিল নামক একটী বিশেষ পদার্থের নির্য্যাস; কিন্তু রূপগত সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা সরিষা, বাদাম প্রভৃতির নির্য্যাসকে সরিষার তৈল, বাদামের তৈল ইত্যাদি বলিয়া তৈল শব্দকে জাতিনাম করিয়া লইয়াছি।

সুতরাং এক্ষণে তৈল শব্দের অর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বালকেরা কিরূপে শব্দ প্রয়োগ করিতে শিখে, তাহা দেখিলেও অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। মনে কর, একটী শিশু ঘোড়া ও কুকুর বাটীতে দেখে ও তাহাদের নাম শিখিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে সে বিড়াল বা ছাগল দেখিলে তাহাকে কুকুর বলিবে, এবং গোরু কি উট দেখিলে ঘোড়া বলিবে। যদি একজাতীয় জীবের রব শুনিয়া তদনুসারে তাহার নামকরণ হয়, এবং বিভিন্ন-রব-বিশিষ্ট অপর জন্তুর প্রতি আকৃতি, গতি বা অন্য কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া সেই নাম বিস্তার করা যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক রবানুগত অর্থ যে লোপ প্রাপ্ত হইবে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

অগোস্ত কোম্‌ত বলিয়াছেন যে, সকল বিষয়েই জ্ঞানের তিনটী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক কার্য্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আমরা প্রথমে দৈবশক্তির আশ্রয় লই; পরে এমন কোন কারণ নির্দ্দেশ করি, যাহার সত্তার প্রমাণ নাই; পরিশেষে পরিজ্ঞাত তত্ত্বগত নিয়ম অবলম্বন করি। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে তিনটী মতের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাতে কোম্‌তের বাক্যের পোষকতা হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে ভাষা দিয়াছেন, ঐতিহাসিক-প্রমাণ-শূন্য বর্ত্তমান-ব্যবহার-বিরুদ্ধ লৌকিক সম্মতি হইতে ভাষা জন্মিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের যে শব্দানুকরণশক্তি দৃষ্ট হইতেছে, সেই শক্তি প্রভাবেই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনটী মত জ্ঞানোন্নতি সংক্রান্ত তিনটী অবস্থার সাক্ষ্য-প্রদান করিতেছে। *

প্রতিভা। ‡

"নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভেত্যুচ্যতে"।

ভূমণ্ডলে যে সকল লোকে প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুইদলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল পুরাতন জ্ঞান ও কার্য্যপ্রণালীতে পরিণত অপরদল নূতন পথদর্শী। একদল অন্য নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, অপর দল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়িতে বা অভিনব প্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিতে পারেন। প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী, এবং শেষোক্ত-দিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়।

* বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯।

‡ বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮০।

কেহ কেহ অন্য নির্ম্মিত কল দেখিয়া তদনুরূপ গড়িতে পারেন; অন্যাবিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন; বা অন্যোদ্ভাবিতভাবে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, কিন্তু নূতন কল নির্ম্মাণ, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার, বা নূতন ভাবের উদ্ভাবন, তাঁহাদিগের শক্তিসাধ্য নহে। এরূপ লোকে কার্য্যক্ষম, বিজ্ঞান-বিৎ, বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্তু প্রতিভশালী বলা যাইবে না। তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আদ্যন্ত রামায়ণ যাঁহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্ত্তায় ও লিখনপঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন হউন না তাঁহার ঈদৃশ দক্ষতা আদিকবি বাল্মীকির নূতন ব্রহ্মাণ্ড সৃজনকারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন।

পূর্ব্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্তশক্তি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অন্ধকারময় অতীতকাল ভেদ করিতে গিয়া রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি, এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে, শকুন্তলাপ্রণেতা কালিদাস প্রথমে মহামূর্খ ছিলেন, পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে কানন প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ব্ব-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণি হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করেন। কেবল ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশেও ঈদৃশ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডীয় পুরাতন পুরাবিৎ বিডি সাহেব বলেন যে প্রসিদ্ধ সাক্সন্ কবি সিড্মন্ প্রথমে এমন সঙ্গীত রসাস্বাদবিহীন ছিলেন যে, গান শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, পরে স্বপ্নাদেশ বশতঃ তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য গীতিশক্তি জন্মে। যদিও ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ প্রকার আকস্মিক দৈবশক্তির আবির্ভাব অপ্রামাণ্য ও অনৈসর্গিক, তথাপি প্রতিভা যে দেবদত্তশক্তি, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একজন হয়ত গণিত বুঝিতে পারিবে না, সাহিত্য রসপান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অম্লানমুখে বলিবে "ইহাতে ত কিছুরই উপপত্তি হইল না।" কেহ হয়ত একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সঙ্গীতের

মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা সুরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া গীতসাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রফুল্ল কুসুমোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভাল বাসিবে; কেহ বা তরুলতা-শূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূন পরিপূরিত বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টি সাধনার্থে আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল, কার্য্যে অপটু, কেহ বা কার্য্যদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার মূল তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা আমি, তুমি, সকলেই কালিদাস বা আর্য্যভট্ট, সেক্ষপিয়র বা নিউটন্ হইতে পারিতাম।

প্রতিভা যদিও আমাদিগের মতে স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলি না যে ইহা শিক্ষানিরপেক্ষ। যদি কেহ আপনাকে প্রতিভাশালী মনে করেন, তিনি যেন স্বপ্নেও ভাবেন না, "আমি শিক্ষাব্যতিরেকেই বড়লোক হইব"। সকল প্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ। যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী। সেক্ষপিয়র "কল্পনার পুত্র" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহাকে লোকে অনেক দিন ধরিয়া অশিক্ষিত ভাবিয়া আসিয়াছে, তাঁহার নাটকনিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে তিনি তাৎকালিক অনেক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ ও বহুবিধ নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আইন ও লাটিন ভাষায় তাঁহার অনেক দূর ব্যুৎপত্তি ছিল। যে কালিদাস "সরস্বতীর বরপুত্র," তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না। তিনি মেঘদূতে ভঙ্গীক্রমে যে নিচুলের উল্লেখ করিয়াছেন, মল্লিনাথ তাহাকে কালিদাসের সহাধ্যায়ী বলেন। পূর্ব্বমেঘের ১৪ শ্লোকে লিখিত আছে,

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্।"

ইহার সামান্য অর্থ এই যে "পথে দিগ্‌হস্তীদিগের শুণ্ডাঘাত পরিহার করিয়া এই সরস বেত্রশোভিত স্থান হইতে উত্তর মুখে আকাশে উঠ।"

মল্লিনাথ বলেন "অত্র ইদমপি অর্থান্তরং ধ্বনয়তি। রসিকোনিচুলো নাম মহাকবিঃ কালিদাসস্য সহাধ্যায়ঃ পরাপাদিতানাং কালিদাসপ্রবন্ধদূষণানাং পরিহর্ত্তা যস্মিন্ স্থানে তস্মাৎ স্থানাৎ উদঙ্মুখো নির্দ্দোষত্বাৎ উন্নতমুখঃ সন্ পথি সারস্বত মার্গে দিঙ্নাগানাং পূজায়াং বহুবচনং দিঙ্নাগাচার্য্যস্য কালিদাসপ্রতিপক্ষস্য হস্তাবলেপান্ হস্তবিন্যাসপূর্ব্বকানি দূষণানি

পরিহরন্ খং উৎপত উচ্চৈর্ভব। ইতি স্বপ্রবন্ধং আত্মানং বা প্রতি কবেরুক্তিরিতি৷

"এখানে এই অর্থান্তর ধ্বনি আছে। রসিকনিচুল নাম মহাকবি কালিদাসের সহাধ্যায়ী এবং কালিদাসের লেখায় বিপক্ষারোপিত দোষের পরিহর্ত্তা। রসিকনিচুল যে স্থানে আছেন, সে স্থান হইতে নির্দ্দোষত্ব হেতু উন্নত মুখ হইয়া, সারস্বত ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট মার্গে প্রতিপক্ষ দিঙ্নাগাচার্য্যের হস্তবিন্যাস পূর্ব্বক দূষণ পরিহার করিয়া, উচ্চ (অর্থাৎ প্রধান) হও। ইহা কবি স্বপ্রবন্ধকে বা আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।"

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতির রচয়িতা যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পড়িয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। তিনি যে অন্যান্য লেখকের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, রঘুবংশের প্রারম্ভে ইহার আভাসও দিয়াছেন; যথা,

অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥ ৪।

১ম সর্গ।

অথবা সূত্র যেমন হীরকাদিকৃত ছিদ্রপথে মণিমধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি পূর্ব্ব পণ্ডিতগণকৃত বাক্যদ্বার দিয়া এই বংশে প্রবেশ করিব।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামে একখানি জ্যোতিষগ্রন্থও কালিদাসের নামে চলিয়া আসিতেছে। তিনি যে চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ জানিতেন, রঘুবংশে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে; যথা,

পিতুঃ প্রযত্নাৎ স সমগ্রসম্পদঃ শুভৈঃ শরীরাবয়বৈ র্দিনে দিনে।
পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরনুপ্রবেশাদিব বালচন্দ্রমাঃ॥

সূর্য্যকিরণ প্রবেশে বাল চন্দ্রের ন্যায় সমগ্রসম্পদসম্পন্ন পিতার প্রযত্নে তাঁহার শরীরাবয়ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কুমারসম্ভবের দ্বিতীয় সর্গ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কবির সাংখ্যদর্শনে ব্যুৎপত্তি ছিল। অতএব কালিদাস যে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যদি কালিদাস ও সেক্সপিয়র অশিক্ষিত না হইলেন, তবে আমরা এক প্রকার ধরিয়া লইতে পারি যে শিক্ষা ব্যতিরেকে কেহই বড়লোক হইতে পারেন না। শিক্ষার স্থল অনেক, বিদ্যালয়, গ্রন্থ, মনুষ্য-সমাজ, বাহ্যজগৎ। ইহার মধ্যে কেহ একটী, কেহ অপরটী হইতে বিশেষ

সাহায্য পান। কিন্তু যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন না করিলে কোনটী হইতে পর্য্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অপর পক্ষে, কেহ কেহ বা শিক্ষার অমৃতময় ফল প্রদর্শন করিয়া এমন মোহিত হন যে, তাঁহারা প্রতিভাকে স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগ মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, "যে কার্য্য কোন ব্যক্তি বারংবার করে, বা যে বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, তাহাতেই তাহার এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে—উহাকেই প্রতিভা কহে; বাস্তবিক, সৃষ্টিকর্ত্তা যে কাহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।"

এতৎসম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, বৈষম্যই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। যদি বল কৃত্রিম সমাজবন্ধনের দোষেই ধন, মান, বিদ্যার ইতর বিশেষ লোকসমাজে ঘটিয়া থাকে, সৌন্দর্য্য, বল ও স্বাস্থ্যের বিষয়ে সে কথা খাটিবে না, কেহ সবল, কেহ দুর্ব্বল; কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত; কেহ সুস্থ, কেহ পীড়িত; এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেহ লইয়া জন্মপরিগ্রহ করেন। কেহ অঙ্গহীন, বিকলেন্দ্রিয়, বা ইন্দ্রিয়বিশেষ-শূন্য। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ বধির বা রসনাহীন। কেহ চক্ষে কম দেখে, কেহ বা বর্ণ বিশেষের উপলব্ধি করিতে পারে না। ঈদৃশ শারীরিক অবস্থাভেদ যখন মনুষ্য সমাজে দৃষ্ট হইতেছে, তখন মানসিক শক্তিভেদও যে লক্ষিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক একটী মানুষও আর একটী মানুষের মত নহে। লক্ষ লোকের মধ্য হইতেও আমরা পরিচিত ব্যক্তিকে চিনিয়া লইতে পারি। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাহ্যাকৃতিগত বৈলক্ষণ্য আছে। যদি বাহ্যিক প্রভেদ থাকিল, আন্তরিক কেন না থাকিবে? যদি এক স্থলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বের উল্লেখ না করি, অপর স্থলেই বা কেন করিব? সামান্য কথায় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করা অন্যায়। আমরা সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রায় কিছুমাত্র বুঝি না। কোন কালে বুঝিতে পারিব, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না। যতদূর আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয় বিশ্বকারণের নিগূঢ় অভিসন্ধি ভেদ করিতে যাওয়া আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত

কল্পনা-প্রদর্শিত কুটিল পথে ভ্রমণ করিতে গেলে যে পদে পদে পদস্খলন হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রতিভা অভ্যাসমাত্র, এই মতটি কতদূর সুসঙ্গত। যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব? অনেক পদ্যলেখক আছেন যাঁহারা ছন্দোগ্রন্থনে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কজন কবি? ভট্টিকারও বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন, কিন্তু কে তাঁহাকে রঘুবংশ রচয়িতার সহিত তুলনা করিবে? তিনি বিলক্ষণ পদ্য লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে?

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে। অভ্যাস কার্য্যসমষ্টিজাত। একটী কার্য্য বারংবার সম্পাদন করিলে তৎসম্পাদন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য হয়, এবং তৎপক্ষে প্রবল প্রবৃত্তি ও দক্ষতা জন্মে। যে বারংবার অনুষ্টুপ লিখে, সে সহজে অনুষ্টুপ লিখিতে পারিবে, কিন্তু বাল্মীকি হইতে পারিবে না। যে বারম্বার দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করে সে সহজে দূরবীক্ষণ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, কিন্তু গালিলিও হইতে পারিবে না। অভ্যস্তবিদ্যা পুরাতনাতিরিক্ত হইতে পারে না। লোকে যাহা করিয়াছে, অভ্যাস দ্বারা তাহাতেই পারদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু যে নূতন সৃষ্টি প্রতিভার অন্তরাত্মাস্বরূপ, তাহা অভ্যাস কোথা পাইবে? আমি ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া (Principia) অভ্যাস করিতে পারি। কিন্তু তাদৃশ অভ্যাস দ্বারা তাঁহাদিগের নিরূপিত তত্ত্বগুলিই জানিতে পারিব, অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব না।

যাহারা বিবেচনা করেন, প্রতিভা মনোযোগ মাত্র, তাঁহাদিগেরও বিষম ভ্রম। যে বিষয়ে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা যায়, সে বিষয়ের সেই পরিমাণে স্মরণ থাকে। কিন্তু স্মরণ দ্বারা পূর্ব্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রতিভার যেটী প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটী নাই। কাজে কাজেই প্রতিভাকে মনোযোগ মাত্র বলা যাইতে পারে না।

যদিও মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে, তথাপি তাহারা প্রয়োজনীয় সহকারী। যিনি কোন বিষয়ের নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে

চাহেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক পুরাতন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। পুরাতন তত্ত্ব সংগ্রহ জন্য মনোযোগ ও অভ্যাসের প্রয়োজন। এইরূপ পুরাতন তত্ত্ব সংগ্রহই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এজন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। কিন্তু যাঁহারা ঈদৃশ শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী; প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিনব তত্ত্বমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।

পূর্ব্বে একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তি এবং তাহার বিশেষ কার্য্য নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্ক্রিয়া। এক্ষণে দেখা যাউক, মনোবিজ্ঞান দ্বারা এতৎসম্বন্ধে কোন মীমাংসা করা যায় কি না।

ভাবুকের মনে নূতন ভাবের উদয়ই নূতন সৃষ্টি বা আবিষ্ক্রিয়ার মূল। প্রজাদিগের সন্তোষ সাধনার্থে চিরদিনের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জনও রাজার কর্ত্তব্য, কবির চিত্তে এই মহদ্ভাবের সঞ্চার হইতেই সীতার বনবাসের সৃষ্টি। পতনশীল ফল ও গগনচর জ্যোতিষ্কগণের গতি একই প্রকার, নিউটনের মনে এই নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতেই মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কার।

ভাবের উদয় উদ্বোধনের নিয়মাধীন। উদ্বোধন দুই প্রকার—সন্নিকর্ষজাত ও সাদৃশ্যজাত। একটি পদার্থ মনে পড়িলে, তৎসমীপস্থ বা তৎসদৃশ পদার্থ মনে পড়ে। যদি কলিকাতার "ইডেন পার্ক" মনে কর, তবে সন্নিকর্ষ বশতঃ গড়ের মাঠ, গড়, গঙ্গা, হাইকোর্টের বাটী, বা টাউনহল মনে পড়িতে পারে। অথবা সাদৃশ্য বশতঃ ইন্দ্রের নন্দন কানন হৃদয়াকাশে প্রতিভাসিত হইতে পারে। হিমালয় পর্ব্বত শব্দটী শুনিয়া কাহার মনে তত্রস্থ তুষাররাশি উদিত হইবে, কাহার মনে বা উন্নত প্রাচীর কিংবা বায়ুসাগরস্থ হিমাদ্রিবৎ নীলাম্বুরাশি মধ্যস্থ দ্বীপমালা। একটি ফুলের কথা বলিলে, কেহ তাহার গন্ধ বর্ণ বা আকার, কেহ বালকের মুখ, যুবতীর যৌবন, বা আকাশের নক্ষত্র ভাবিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এইরূপ সন্নিকর্ষ বা সাদৃশ্যবশতঃ অনুক্ষণ আমাদিগের অন্তঃকরণে একভাব হইতে ভাবান্তর উপস্থিত হইতেছে। চিন্তাস্রোত অবিরাম বহিতেছে; সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন গতির স্থিরতা নাই, কখন এদিকে কখন ওদিকে, কখন সেদিকে যাইতেছে। মনোনিবেশ কর, দেখিবে দুইপাশে দুইটী অনতিক্রম্য তীর, সন্নিকর্ষ ও সাদৃশ্য; উভয়ের মধ্য দিয়াই স্রোতের গতি, উভয়ের আঘাতেই স্রোতের বিচিত্রতা।

যদিও মনুষ্যমন উপরিনির্দ্দিষ্ট উভয়বিধ উদ্বোধনেরই রঙ্গভূমি, তথাপি সাধারণ লোকের অন্তঃকরণে সন্নিকর্ষজাত উদ্বোধনই প্রবল। কোন একটী ঘটনা মনে পড়িলে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, পার্শ্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী সমীপস্থ ঘটনার প্রতি তাহাদিগের যেমন দৃষ্টি পড়ে, তৎসদৃশ ঘটনার প্রতি তেমন পড়ে না। অগ্নি বলিলে দাহন, জল বলিলে অগ্নিনির্ব্বাণ, গো বলিলে দুগ্ধ, তাহাদিগের মনে পড়িবে; কেন না অগ্নিসন্নিকর্ষে দাহন, জলসন্নিকর্ষে অগ্নিনির্ব্বাণ, গোসন্নিকর্ষে দুগ্ধ, তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। কিন্তু সাদৃশ্য জন্য সূর্য্য, পারদ ও মহিষ তাহাদিগের স্মরণে আসিবে না। তথাপি অগ্নিতে দাহন ঘটে, জলে অগ্নিনির্ব্বাণ হয়, গো দুগ্ধদাত্রী, ইত্যাদি লৌকিক জ্ঞান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে এত প্রয়োজনীয় যে, জনসমাজে সন্নিকর্ষজাত উদ্বোধনের প্রবলতাকে আমরা দোষ বিবেচনা করি না; বরঞ্চ সাংসারিক কার্য্যসম্বন্ধে ইহার মহোপকারিতা স্বীকার করি।

কাহার কাহার মনে সাদৃশ্যজাত উদ্বোধনই প্রবল কোন একটী পদার্থ জ্ঞানগোচর হইলে, তৎসদৃশ বস্তুর প্রতি তাঁহাদিগের চিত্ত সবেগে ধাবিত হয়। তাঁহারাই প্রতিভাশালী। তাঁহারাই অনন্যধৃষ্টসাদৃশ্য নির্ণয় করিতে সক্ষম বলিয়া আবিষ্কার বা সৃষ্টিকার্য্যে অধিকারী। কি বিজ্ঞানবিৎ, কি কবি, কি শিল্পী, সকলের প্রতিভার মূলেই এই সাদৃশ্যোদ্ভেদশক্তি লক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠে পতনশীল পদার্থের গতি গগনচর জ্যোতিষ্কমণ্ডলগণের গতি-তুল্য, ইহাই দেখিতে পাইয়া নিউটনের এত গৌরব। উপমাবলেই কালিদাস জগদ্বিখ্যাত। সদৃশভাব ব্যঞ্জক শব্দ বা বস্তুবিন্যাস দ্বারা কবি বা শিল্পিকুল রস বিশেষের অবতারণা করিয়াই তাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করেন।

সাদৃশ্য নির্ণয়শক্তি সকলেরই কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু সাধারণ লোকে স্থূল সাদৃশ্যই দেখিতে পায়। একটী গোলাপ দেখিয়া তাহাকে পুষ্পশ্রেণীতে ফেলিতে পারে, একটী ঘোড়া দেখিয়া তাহাকে চতুষ্পদ-শ্রেণীতে ফেলিতে পারে, ইত্যাদি। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ অন্যের নিকট বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থ নিচয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পান। যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু বা নক্ষত্র জ্যোতির্ম্ময় রূপ দ্বারা নীলাকাশ অলঙ্কৃত করিয়া অজস্র বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহাদিগের গতি যে

বৃক্ষচ্যুত ফল বা হস্তচ্যুত প্রস্তরের ন্যায় একই নিয়মের অধীন, ইহা বুঝিতে পারা সামান্য শক্তির কর্ম্ম নহে।

সাদৃশ্য নির্ণয়শক্তি প্রতিভার মূল হইলেও সকলের প্রতিভা সকল দিকে সঞ্চালিত হইতে পারে না। কেহ সাধারণতত্ত্বের পক্ষপাতী; তিনি বিজ্ঞান-বিৎ বা দর্শনবিৎ হইতে পারেন। কেহ বা বিশেষ বিশেষ পদার্থের মূর্ত্তি স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রাখিতে সক্ষম; তিনি চিত্রকর হইতে পারেন। কেহ চিত্তাবেগোদ্ভূত ভাবের অধীন; তিনি রসোদ্দীপক কবি বা শিল্পী হইতে পারেন। কেহ বা বিবিধ রাগসম্ভূত স্বরভঙ্গী নির্ব্বাচনে নিপুণ; তিনি গায়ক হইতে পারেন। কেহ এইরূপ একাধিকশক্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন।

প্রতিভার উল্লিখিত প্রকার প্রভেদ কিরূপে উৎপন্ন হয়, নির্ণয় করা কঠিন। উহা বংশানুগত হইতে পারে। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজেহান, আওরঙ্গজেব, সকলেই যোদ্ধা ছিলেন; সেইরূপ ফিলিপ ও আলেকজণ্ডর, হামিল্কার ও হানিবল; সেইরূপ আমাদিগের দেশীয় রাজপুতগণ। সেইরূপ বিদ্যাবিষয়ে জেম্‌স্ মিল ও জন ষ্টুয়ার্ট মিল, স্যর উইলিয়ম হর্শেল ও স্যর জন হর্শেল, ইত্যাদি। এইরূপ কারণেই বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক কল্পনাপ্রিয় বা তত্ত্বানুসন্ধায়ী, চিন্তাশীল বা কার্য্যক্ষম, দার্শনিক বা শিল্পী, ইত্যাদি। প্রতিভা যে বংশানুগত গ্যালটন সাহেব* ইহার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এ প্রবন্ধে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

যিনি যে প্রকার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উপযোগী অবস্থায় পতিত না হইলে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। একটী সতেজ বৃক্ষও ছায়ায় প্রোথিত করিলে, তাহা সূর্য্যকিরণাভাবে হতশ্রী ও নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতিবিরুদ্ধ ঘটনাসমূহে সমাবৃত হইলে, স্বাভাবিক তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয়। প্রতিকূল সংসর্গে বিপদেরই সম্ভাবনা। এজন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রতিভার বিকাশ নিমিত্ত অনুকূল শিক্ষার প্রয়োজন।

---

* See Galton on Hereditary Genius.

কোম্‌ত দর্শন।*

কোম্‌ত দর্শন লইয়া এক্ষণে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য সমাজে অনেক আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উক্ত সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ চেষ্টা করিতেছেন। কেহ কেহ বা তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় প্রধান প্রধান মতগুলি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কোম্‌ত কেবল দার্শনিক নহেন, তিনি একজন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক। এই প্রবন্ধে আমরা তদীয় Positive philosophy অর্থাৎ "প্রামাণিক দর্শনের" স্থূল স্থূল কথাগুলি বলিব।

কোম্‌ত বলেন যে, জগৎকার্য্য সম্বন্ধে মনুষ্যসমাজে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইয়া থাকে; প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক; দ্বিতীয়, দার্শনিক, কাল্পনিক শক্তিমূলক; তৃতীয় বৈজ্ঞানিক প্রামাণিক বা নিয়মমূলক। সকল বিষয়ে জ্ঞানেরই উন্নতি পথে ক্রমান্বয়ে এই তিনটি সোপান আছে।

লোকে যখন প্রথমে বিশ্ব ব্যাপার বুঝিতে যায়, তখন প্রত্যেক কার্য্যের একটি একটি সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার একটী গূঢ় কারণ আছে। আমাদিগের জ্ঞান স্ফূর্ত্তি হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, আমরা যে সকল কার্য্য করি, সে সকল আমাদিগের সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতেই সমুদ্ভূত। এ নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় যেখানে যে কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, সেখানেই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। এই কারণেই শিশুগণ গতিবিশিষ্ট বা কার্য্যকারী নির্জ্জীব পদার্থদিগকে সজীব জ্ঞান করে। এই কারণেই প্রাচীনকালে মানবগণ প্রচণ্ড ঝটিকাপ্রবাহে, ক্ষুব্ধ সিন্ধুসলিলে, তিমিরবিনাশী দিবাকরে, গৃহকাননগ্রাসী অনলরাশিতে, বিদ্যুন্মালাশোভিত বজ্রগর্জ্জনে, দেবতা দেখিতেন।

এইরূপে পুরাকালে পুরাণবর্ণিত বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞানের প্রথম সোপানকে পৌরাণিক বলা গিয়াছে; আর প্রত্যেক ঘটনাতে তাঁহাদিগের জ্ঞান ও ইচ্ছা বিদ্যমান

* বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮১।

দৃষ্ট হইত বলিয়া, পৌরাণিক ব্যাখ্যাকে আধ্যাত্মিক ও ইচ্ছামূলক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

কালে কালে, যত জগতের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, ততই লোকে জানিতে পারে যে পূর্ব্বে যে সকল পদার্থকে সচেতন বিবেচনা করিয়াছিল চৈতন্যের পরিচায়ক লক্ষণগুলিই তাহাদিগের নাই। তখন তাহাদিগের দ্বারা কিরূপে কার্য্য সাধন হয় এইরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়া, স্থিরীকৃত হয় যে, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। এ প্রকার অনুমান অস্বাভাবিক নহে। ইচ্ছার চৈতন্যাংশ বাদ দিলে, কার্য্যসাধিকা শক্তি ভিন্ন আর কি থাকে? কিন্তু এতদ্দ্বারা কি কোন কার্য্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়? আদিমাবস্থায় লোকে ভাবে, অগ্নি দেবতা, আমাদের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তুনিচয় ধ্বংস করেন; দ্বিতীয়াবস্থায় লোকে কল্পনা করে যে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে তাহাতেই পদার্থ সকল দগ্ধ হয়। কিন্তু অগ্নিতে পদার্থনিচয় দগ্ধ হয়, এতদতিরিক্ত কি জ্ঞান দাহিকাশক্তির নিকটে পাওয়া গেল? যখন পৌরাণিক মতে অনাস্থা জন্মিয়া দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার আরম্ভ হয়, তখন ঈদৃশ শক্তি সকল পরিমাণে কল্পিত হয় বলিয়া, জ্ঞানের দ্বিতীয় সোপানের নাম দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তি মূলক রাখা হইয়াছে।

পরিণামে অনেক দেখিয়া শুনিয়া লোকে অবগত হয় যে সকল কার্য্যেরই নিয়ম আছে; অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা কোন বিষয়ে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কার্য্যসাধিকা শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিয়মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই। নিয়মই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য এবং বিজ্ঞান পদে পদে প্রমাণ চায়। এ নিমিত্ত জ্ঞানের চরম সোপানের নাম বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক, বা নিয়মমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

কোম্‌ত বলেন যে বিশ্বমণ্ডলের সকল বস্তুই নিয়মের অধীন। আকাশে যে ধূমকেতু কখন কখন দেখা যায়, আর মানুষের মনে যখন যে ইচ্ছা উদিত হয়, সকলই নিয়মের অধীন। পৃথিবীতে লোকের পদাঘাতে যে রেণুরাশি উড়িতে থাকে, নভোমণ্ডলে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কগণ বিরাজিত, মনুষ্যসমাজে যখন যে ঘটনা ঘটে, সকলই নিয়মের অধীন। ঊর্দ্ধ্বে

ছুটিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, পাখী উড়িতেছে, মৎস্য সন্তরণ করিতেছে, মানব-সন্তান হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, নাচিতেছে, গাইতেছে, সমাজ বিশেষের উদয় উন্নতি বা বিলয় হইতেছে, সকলই নিয়মানুসারে। কিন্তু কোম্‌ত যদিও নিয়ম-ভক্ত, তথাপি তিনি অদৃষ্টবাদী নহেন। তিনি বলেন,* বিজ্ঞানের অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রতি অদৃষ্টবাদ দোষ যে আরোপিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ যখন কোন প্রকার কার্য্য ইচ্ছার অধিকার হইতে নিয়মের অধিকারে আইসে, নিয়মের স্থৈর্য্য ইচ্ছার অস্থিরতার সহিত তুলনায় এত অবিচলিত লক্ষিত হয় যে, অদৃষ্টশাসনবৎ প্রতীয়মান হইবারই কথা। প্রথমে গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতি হইতে নৈসর্গিক নিয়মের যে প্রকার জ্ঞানলাভ হয়, তাহাতেও এইরূপ ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা; যেহেতু যত কেন ইচ্ছা করি না, আমরা তাহাদিগের গতি পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম নহি। যদিও প্রকৃতির নিয়মাবলী অপরিবর্ত্তনীয়, তথাপি জ্যোতিষাধিকার-বহির্ভূত জগৎকার্য্য সকল অনেকদূর পরিবর্ত্তনীয়। তাপ, তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ, রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বিবিধ প্রকার জীব, এবং সামাজিক ঘটনা, কত দূর মনুষ্যের ক্ষমতাধীন, প্রতিদিনই দৃষ্ট হইতেছে। যদিও নিয়মানুসারে সকলই ঘটে তথাপি ইচ্ছানুসারে তাপ, তাড়িত প্রভৃতি কমাইয়া বাড়াইয়া, রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করিয়া, জীববিশেষকে কার্য্যবিশেষে নিয়োগ করিয়া, কোনরূপ সমাজ সংস্কার কার্য্যের সূচনা করিয়া অভিমতানুরূপ সংযোগ বিয়োগ দ্বারা মানবগণ জগতে কত প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছে।

কোম্‌ত যদিও বিবেচনা করেন যে জগৎকার্য্য এবং তদীয় নিয়ম এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার অধিকার আমাদের নাই, যদিও তিনি বলেন জগতের মূলকারণ ও চরম লক্ষ্য অপরিজ্ঞেয়, তথাপি তিনি নাস্তিক নহেন। তাঁহার মতে নাস্তিকেরা অজ্ঞেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত; তাহারা জগতের উৎপত্তি, জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি অননুসন্ধেয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত। তিনি কহেন যে, যদি নৈসর্গিক নিয়মাতিরিক্ত জগৎকার্য্য শৃঙ্খলসমুৎপাদক গূঢ় কারণের তত্ত্বানুসন্ধান কর, তাহা হইলে

---

* See "A General view of positivism translated from the French of Auguste Comte by J. H. Bridges," pp. 57 and 58.

তন্নিহিত বা তদ্বহিঃস্থ ইচ্ছাবিশেষ কল্পনা করা যেমন সঙ্গত এমন আর কিছুই নহে ; কারণ এরূপ অনুমান দ্বারা আমাদিগের কার্য্যসম্ভবা ইচ্ছার সহিত তাহার সাদৃশ্য রক্ষিত হয়। দার্শনিক শিক্ষাজনিত অহঙ্কার না থাকিলে, কেহই এমন সহজ ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কষ্টকল্পনা করিতে যাইত না ; এবং যত দিন না লোকে নির্ব্বিকল্পক সত্যানুসন্ধানের নিষ্ফলতা বুঝিয়াছিল, ততদিন এই ব্যাখ্যাতেই মনুষ্যবুদ্ধি সন্তুষ্ট ছিল। কোম্‌তের বিবেচনায় প্রকৃতির পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহ অনেক দোষ আছে ; কিন্তু সচেতন ইচ্ছা হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, এ অনুমানটি যেমন সঙ্গত, অচেতন যন্ত্রবাদ তেমন নহে। সুতরাং তিনি বলেন যে নাস্তিকেরা পৌরাণিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিহীন ; কারণ তাহারা পৌরাণিক বিষয় লইয়া ব্যস্ত, অথচ তদুপযোগী অনুসন্ধান প্রণালী পরিত্যাগ করিয়াছে।*

কোম্‌ত প্রকৃতির পদ্ধতিতে কিরূপে দোষারোপ করেন, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার চক্ষে যাহা দোষ বলিয়া লাগে, তাহাই কি প্রকৃত দোষ ? বিজ্ঞানবিৎ ও বহুদর্শী হইয়া তিনি কি প্রকারে এরূপ অযৌক্তিক মত

---

* "If we insist upon penetrating the unattainable mystery of t
tial Cause that produces phenomena, there is no hypothesis m
factory than that they proceed from Wills dwelling in them or
them ; an hypothesis which assimilates them to the effect produ
the desires which exist within ourselves. Were it not for the pride in
by metaphysical and scientific studies, it would be inconceiva ypo-
any atheist, modern or ancient, should have believed that his va pla
theses on such a subject were preferable to this direct mode ason, un
tion. And it was the only mode which really satisfied ch for absolute
men began to see the utter inanity and inutility of all in every respect
truth. The Order of Nature is doubtless very imperf e hypothesis of
but its production is far more compatible with nism. Persistent
an intelligent Will than with that of a blind me cal of theologists ;
atheists therefore would seem to be the most il problems, and yet
because they occupy themselves with theologic " General View
reject the only appropriate method of handling
of Positivism p. 50.

প্রচার করিলেন? আমরা জগতের একদেশ মাত্র দেখিতেছি, তদুপযোগী যাহা লক্ষিত না হয়, সমুদয় বিশ্বমণ্ডল সম্বন্ধে তাহার অস্তিত্বের আবশ্যকতা নাই, আমরা কি সাহসে বলিব? যদি বলিতে যাই, তাহা হইতে কি আমরা ধরিয়া লই না যে আমরা সকল বস্তুর বা প্রাকৃতিক কার্য্যের চরম উদ্দেশ্য জানি? যাহারা বিবেচনা করে যে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা আমাদিগকে আলোক প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কার্য্যে দোষারোপ করিয়া কি কোম্‌ত তাহাদিগের দলে পড়িতেছেন না?

জগতীস্থ সমস্ত ব্যাপারই যে নিয়মের অধীন, কোম্‌ত যদিও এ মতের প্রতিপোষক অনেক কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি ইহার সংস্থাপক নহেন। বহুকাল হইতে বিজ্ঞানবিৎ সমাজে এমতটী চলিয়া আসিতেছে; এবং বহুবিস্তীর্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে। এক একটী নৈসর্গিক নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া ইহার আর একটী মূল; এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত্নে ইহার পুষ্টিসাধন হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে ইহার প্রভাবের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। গালিলিও গতির নিয়ম, এবং নিউটন মাধ্যাকর্ষণ, আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে গগনমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণ নিয়ম-প্রভৃতি বদ্ধ। লাভইসর, ডেবি, ফ্যারাডে, ড্যালটন প্রভৃতির যত্নে করিয়া, হইয়াছে যে পদার্থ সকল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংযুক্ত বিযুক্ত হয়। সংস্কার ব ichat) গল (Gall) প্রভৃতির পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে জগতে যন্ত্র নিচয়ের কার্য্য সকলও নিয়মের অধীন। অর্থশাস্ত্রবিৎ, নীতি-

২ এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা সামাজিক ঘটনা সমূহের নিয়ম-এতন্ত্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে বিজ্ঞানবেত্তৃদলে এই সংস্কারটী তিনি হইয়াছে, যে সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যন্ত, নাস্তিক নহেন, হইতে যুক্তিশালী মনুষ্য মনের চিন্তা পর্য্যন্ত, সমুদয় বিশ্ব প্রবৃত্ত; তাহারা ন।

ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত সম্বন্ধে যথাক্রমে তিন প্রকার ব্যাখ্যা অবলম্বন করি জগৎকার্য্য শৃঙ্খলসমূতন নহে। হিউম্ এবং তুর্গোর গ্রন্থে ইহার আভাস

e Hume's Natural History of Religion and

* See "A Ge Progress successifs de Pesprit humain]। কিন্তু

of Auguste Comte নাপ্রকার ঘটনার ব্যাখ্যা এতদ্দ্বারা করিয়াছেন, সেরূপ

আর কেহই করেন নাই, এবং ইহার কীদৃশ বহুবিস্তীর্ণ প্রয়োগস্থল আছে, আর কেহই বিশদরূপে বুঝিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং সম্পূর্ণ রূপ নূতন না হউক কোম্ত যে ইহাকে অনেক নূতনত্ব দিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন, এবং এক প্রকার যে তিনি ইহার প্রকাশক নামের অধিকারী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, পিথাগোরস্ এবং আর্য্যভট্ট যদিও পূর্ব্বকালে একথা কহিয়াছিলেন, তথাপি কোপর্ণিকস এতৎ সংক্রান্ত প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ সৌরকেন্দ্রিক জ্যোতিষিক মত সংস্থাপক রূপে পরিগণিত, তদ্রূপ জ্ঞানোন্নতি বিষয়ক সোপানত্রয়ের আভাস হিউম্ এবং তুর্গোর লিখিত প্রবন্ধে লক্ষিত হইলেও কোম্তকে উহার সংস্থাপক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জ্ঞানানুশীলনের প্রারম্ভ সময়ে সমুদায় বিজ্ঞান শাখার সমান অবস্থা ছিল; সর্ব্বত্রই পৌরাণিক ব্যাখ্যা অবলম্বিত হইত। কিন্তু সমকালে সকল শাখা সমান উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। কোনটা বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে, কোনটা দার্শনিক সোপানে; কোনটা বা পৌরাণিক সোপানেই পড়িয়া রহিয়াছে। কোম্ত বলেন, যাহার বিষয় যত স[illegible] তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হইয়াছে। [illegible] অনেক জটিলতা নিবন্ধন কোনটা বা দার্শনিক, কোনটা বা পৌরাণিক [illegible] বা আছে। এইরূপে দৃষ্ট হয় যে একই ব্যক্তির কোন বিষয়ে বৈজ্ঞা[illegible] কোন বিষয়ে দার্শনিক মত, এবং কোন বিষয়ে পৌরাণিক মত। [illegible] যে ভেদেও ভিন্ন ভিন্ন ফল লক্ষিত হয়। যে বিষয়ে জাতিবিশেষের বৈজ্ঞা[illegible]মণি মত, তদ্বিষয়েই জাত্যন্তরের দার্শনিক বা পৌরাণিক মত। এই [illegible]করিতে সংসারে অনেক মতবৈষম্য ঘটিয়াছে। প্রথমে যেমন সকল বিষয়ে [illegible] আখেন্দ ব্যাখ্যা গৃহীত হইত বলিয়া লোকসমাজে ঐকমত্য [illegible]রিত, এই উন্নতি-কোম্তের বিবেচনায় বিজ্ঞান দ্বারা তদ্রূপ একতা সংস্থা[illegible] [illegible]ক্তিবর্গও সেইরূপ সকল শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে বৈজ্ঞানিক পদ পাইয়াছে, পণ্ডিত[illegible] সম্বন্ধে মতভেদ অত্যল্পই দেখা যায়; যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্ট [illegible] [illegible]াহার অর্থের আভাস জটিলতার ফল। ক্রমেই বিজ্ঞানের অধিকার বাড়িতেছে [illegible] [illegible]রিলেই জানা যায় অধিকার কমিতেছে। সুতরাং এরূপ আশা করা অ[illegible] [illegible] বলিতে বুকের উপর ক্রমে বিজয়ী বিজ্ঞানের রাজ্য সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র ঐ[illegible]

ভূমণ্ডলের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে, সাধারণতঃ কোম্‌তের মতের সত্যতা অনেক দূর দেখা যায়। জ্ঞানবিভূষিত ইউরোপখণ্ডে গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন বৈজ্ঞানিক সোপানে উঠিয়াছে; কিন্তু শারীরতত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্বের অনেকাংশ দার্শনিক বা পৌরাণিক সোপানে রহিয়াছে। এতদ্দেশে কেহ চন্দ্রসূর্য্যকে দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের উপাসনা করিতেছেন, কেহ তাহাদিগকে জড় বিবেচনা করিয়াও তাহাদিগের শুভাশুভফলবিধায়িনী শক্তিতে প্রত্যয় স্থাপনা করেন, এবং কেহ বা তাহাদিগের আকার, গতি প্রভৃতি জানিয়াই সন্তুষ্ট। ভারতবর্ষে জল প্রথমে বরুণদেবের আবাস বলিয়া গণ্য হইত; পরে স্নেহশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহার কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা হইত; এক্ষণে উদজান ও অম্লজানের সমষ্টি বলিয়া উহা শিক্ষিত সমাজে পরিগৃহীত। অগ্নি পূর্ব্বে দেবতা ছিলেন, পরে দাহিকা শক্তিশালী বলিয়া দহননিপুণ হইয়াছিলেন; এক্ষণে রাসায়নিক কার্য্যবিশেষের ফল বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু ভাল করিয়া কোম্‌তের মত বুঝিতে হইলে তদীয় বিজ্ঞানবিভাগের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি বলেন যে বিজ্ঞানসকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ মুখ্য বা সামান্য এবং ২ গৌণ বা বিশেষ। সম্ভব স্থল মাত্রে
ম।
প্রভৃতি এরূপ নিয়মাবলীর আবিষ্কার করা মুখ্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং
করিয়া, ঐ নিয়ম দ্বারা বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ
সংস্কার ব। উদ্দেশ্য।*
জগতে ...াং জানা যাইতেছে যে, শারীরতত্ত্ব মুখ্য বিজ্ঞান, কিন্তু উদ্ভিজ্জবিদ্যা
প্রাণিবিদ্যা গৌণ বিজ্ঞান; রসায়ন মুখ্য বিজ্ঞান, এবং খনিজবিদ্যা
এতক্ষণ ...ন, ইত্যাদি। প্রত্যেক গৌণ বিজ্ঞানে অনেকগুলি মুখ্য বিজ্ঞানের
তিনি হইং ...। উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হইলে
নাস্তিক নহেন ...ব জানিলে চলিবে না। উদ্ভিদ্ এবং জীবদেহে তাপাদির
প্রবৃত্ত; তাহারা

ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত
জগৎকার্য্য শৃঙ্খলসূ

* See "A Gen... [illegible] ...tinguish between the two classes of Natural Science ... general which have for their object the discovery of ...ulate phenomena in all conceivable cases; and the ...r, or descriptive, which are sometimes called Natural ...ted sense, whose function it is to apply these laws to ...of existing beings,"—Positive Phliosoply, freely of Auguste Comte ...ensed by Harriet Martineau.

কার্য্য বুঝিতে পদার্থতত্ত্ব, পুষ্টিসাধনাদি বুঝিতে রসায়ন, এবং বর্ত্তমান জীবোদ্ভিদগণের সংস্থান ও গুণ সকল বুঝিতে মনুষ্যপ্রভাবপ্রকাশক সমাজ-তত্ত্ব জানা আবশ্যক। এইরূপ খনিজবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব এবং শারীরতত্ত্ব জানা চাই। পাথুরিয়া কয়লাও একটি খনিজপদার্থ, কিন্তু পদার্থতত্ত্ব ও শারীরতত্ত্ব না জানিলে কে উহার প্রকৃতি এবং উপাদান প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারে ?

মুখ্য বিজ্ঞানদিগকে আবার পরস্পরের সাপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া কোম্‌ত শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথমস্থান তিনি গণিতকে দিয়াছেন; কারণ ইহার বিষয় সংখ্যা, বিস্তৃতি ও গতি, এবং এ সকলের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে অন্য কোন বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক করে না। তাঁহার মতে জ্যোতিষ দ্বিতীয় স্থানের যোগ্য, কারণ ইহাতে গাণিতিকতত্ত্বাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম মাত্র লইতে হয়। তৃতীয়স্থান পদার্থতত্ত্বকে প্রদত্ত হইয়াছে; যেহেতু উহাতে গণিতের সাহায্য আবশ্যক এবং মাধ্যাকর্ষণজনিত গুরুত্বাতিরিক্ত তাপ, তাড়িত, শব্দ প্রভৃতির তত্ত্ব নির্ণীত হয়। চতুর্থস্থানে রসায়ন সংস্থাপিত হইয়াছে; কেননা তাপতাড়িতাদির সহায়তায় পদার্থ-সংযোগের নিয়মাবলী নিরূপণ করাই রসায়নের উদ্দেশ্য। পঞ্চমস্থানে শারীরতত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে; কারণ ইহাতে রাসায়নিক কার্য্যাতিরিক্ত অনেক দৈহিক ব্যা[illegible] মীমাংসা করিতে হয়। ষষ্ঠস্থান সমাজতত্ত্বকে দেওয়া হইয়া[illegible] শারীরিকতত্ত্বনিচয়কে মূল করিয়া সামাজিক নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা ক[illegible] অভিপ্রায়। সপ্তমস্থানে নীতিতত্ত্ব রক্ষিত হইয়াছে; কারণ প্রত্যে[illegible] সহিত সমাজের সম্বন্ধ নিরূপণ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। বিজ্ঞানশা[illegible] পরস্পর সাপেক্ষতানুসারে শ্রেণীবন্ধনের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি [illegible] যে, যাহার বিষয় যত জটিল তাহাই তত অন্যসাপেক্ষ, এবং যাহার [illegible] সরল তাহাই তত অন্য নিরপেক্ষ। গণিতের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] গণিতই সর্ব্বনিরপেক্ষ। নীতিতত্ত্বের বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা জ[illegible] সর্ব্বসাপেক্ষ। অন্যান্য বিজ্ঞানশাখাগুলির জটিল[illegible] অপরসাপেক্ষ।

কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায় যে, যে বি[illegible] সাপেক্ষ, তাহা তত বিলম্বে বৈজ্ঞানিক সোপানে [illegible] ইতিহাসও এইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, গণিত[illegible]

সোপানে উঠিয়াছে; তদনন্তর জ্যোতিষ; তার পর পদার্থতত্ত্ব; তৎপরে রসায়ন। শারীরতত্ত্বের কিয়দংশমাত্র বৈজ্ঞানিক পদে উন্নত হইয়াছে; সমাজতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রায় সর্ব্বত্রই পৌরাণিক বা দার্শনিক সোপানে পড়িয়া রহিয়াছে। কালসহকারে বিজ্ঞানশাখানিচয়ের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাহার বিষয় যত সরল তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়।

কোম্‌ত মুখ্য বিজ্ঞানগুলিকে যেরূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দুইটি দোষ দৃষ্ট হয়; প্রথম এই যে, তিনি অন্যায়পূর্ব্বক জ্যোতিষকে মুখ্য বিজ্ঞান-দলভুক্ত করিয়াছেন, দ্বিতীয় এই যে, তিনি মনস্তত্ত্বকে অবিবেচনাপূর্ব্বক উক্ত দলে স্থান দেন নাই। তিনি যখন বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পদার্থপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা গৌণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এবং যখন তিনি এই কারণে খনিজবিদ্যা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা, এবং প্রাণিবিদ্যাকে গৌণবিজ্ঞান শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, তখন তিনি কি প্রকারে জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে গৌণ বিজ্ঞান না বলিবেন? বর্ত্তমান সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং তারকাপুঞ্জের প্রকৃত ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করাই জ্যোতিষের উদ্দেশ্য। যদি বল সম্ভব স্থল মাত্রে খাটে এরূপ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম নির্ণয়ও জ্যোতিষের কার্য্য, আমাদিগের বিবেচনায় ...ভ্রম। গণিতের যে ভাগ দ্বারা গতির নিয়মাবলী নির্ণীত হয়, মাধ্যাকর্ষণ ...লোচ্য একটি বিষয় মাত্র।

...দিগের বোধ হয় যে সমাজতত্ত্বের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মনস্তত্ত্ব সংস্থাপন ...শ্যক। কেবল কতকগুলি শরীরীর সংযোগে সমাজ সংগঠিত হয় ...াননে অসংখ্য তরুলতা একত্রে আছে; কিন্তু সেখানে আমরা সমাজের ...স্বীকার করি না। যেখানে আমরা মনের সহিত মনের ঘাত প্রতিঘাত লক্ষি করি, যেখানে অনেকের মন একত্রিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখি, ...কেবল আমরা সমাজ আছে বলিয়া থাকি। অতএব যে মন সমাজের ...বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সংগ্রহ না হইলে সমাজ তত্ত্বের ভিত্তি- ...সুতরাং সমাজতত্ত্বের পূর্ব্বে মনস্তত্ত্ব সন্নিবেশ করা চাই। ...থ, শরীরীমাত্রেই মনবিশিষ্ট নহে। জন্ম, পুষ্টিসাধন, ... শরীরী সকলেরই আছে; কিন্তু অর্দ্ধেকের প্রায়, অর্থাৎ ...র, মন নাই। সুতরাং শরীরী মাত্রের সাধারণ ...তানের বিষয় রাখিয়া মানসিকতত্ত্ব সমুদায় লইয়া একটি

বিজ্ঞানশাখা সংস্থাপন করা উচিত। এতৎসম্বন্ধে আরও একটী কথা বলা যাইতে পারে। গণিত হইতে শারীরতত্ত্ব পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রের তথ্যনির্ণয়ার্থে আমরা কেবল বহিরিন্দ্রিয় সাপেক্ষ। মনস্তত্ত্বানুসন্ধানার্থে আমরা একটি নূতন যন্ত্র পাইতেছি; সেটি আমাদিগের অন্তরিন্দ্রিয়। কোম্‌ত বলেন যে আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার শক্তি আমাদিগের নাই; কারণ যখনই আমরা কোন মানসিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিতে যাই, তখনই তাহা বিলীন হইয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই, যখন আমরা প্রতিক্ষণে জানিতে পারিতেছি যে, আমাদিগের মনে সুখ দুঃখ কি কোনরূপ চিন্তা উদিত হইতেছে, তখন আমাদিগের আপন আপন মানসিক ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কিয়ৎ পরিমাণে আছে, তাহার সন্দেহ নাই। আর ইহাও কাহারও অবিদিত নহে যে স্মৃতি দ্বারা বিগত মানসিক অবস্থার জ্ঞান অনেকদূর লাভ করা যায়। সুতরাং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সত্য নির্ণয় বিষয়ে কোম্‌তের আপত্তি বিফল হইতেছে।

কোম্‌তের মতে জ্ঞানোপার্জ্জনের উপায় তিনটী; পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ বলে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা প[illegible] করিয়া কোন বিষয়ের পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুস[illegible] বিশদ করিয়া বুঝিবার জন্য দেশকালপাত্রভেদে তদীয় পর্য্যালোচনা[illegible] বলে, আমাদিগের বোধ হয় যে, অন্তরিন্দ্রিয়গোচর বলিয়া আম[illegible] মানসিক ব্যাপারও পর্য্যবেক্ষণের বিষয়; এবং উপমাটি এক প্রকার [illegible] প্রতিষ্ঠিত পরীক্ষা মাত্র। কোম্‌ত দেখাইয়াছেন যে বিষয়ের জটিলতার [illegible] সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বনিরূপণের উপায় বৃদ্ধি ঘটে। গণিতে পর্য্যবেক্ষণ করি[illegible] কি না আমরা বুঝিতে পারি না। জ্যোতিষে কেবল চক্ষুদ্বারা [illegible] করিতে হয়। পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়নে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের [illegible] এবং পরীক্ষা চলে। শারীরতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, এবং নী[illegible] পরীক্ষা, এবং উপমা তিনটীরই অনেক স্থলে ঘটে। [illegible] পরিত্যাগ না করিতেন, তাহা হইলে তিনি যে আর একটী [illegible] বিশেষ উল্লেখ করিতেন, ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র।

সভ্যতা।*

আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটী লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবার্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায় ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে সভ্যতা কাহাকে বলে আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না; আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরমসোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহকেহ বলেন ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের আচার ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন; কেহ ইংরেজদিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে ইংরেজদিগের অনুকরণে আমাদিগের অবনতি হইবে; কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন যে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ ...রে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, মৃন্ময় দীপের ... লেখা পড়া করি।† শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, ... কলিকাতার লালবাজারের মদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য গোরাকেও সভ্য ... প্রস্তুত; কিন্তু ধুতিচাদরপরা নিরামিষভোজী নির্ম্মলজলপায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ...কেও অসভ্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ হইবার প্রথম কারণ ... আমরা এক্ষণে দুইটী প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় ... (২) বিলাতি শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে একদিকে লইয়া

---

* ...খ, ১২৮৪।

† "... to reflect that the most learned works on European ...nce should be studied and appreciated by the student ...t, eats with his fingers, does not think it necessary to ... reads under the light of the primitive earthen lamp"— ...hose on English Education.

যাইতেছে; বিলাতি শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে, এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতি, চিরাগত আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড উত্তম। বিলাতি শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্য রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ও কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহিমা পুরাতনপ্রণালীসম্ভূত। বিলাতী শিক্ষা বলিতেছে যে পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে কেহ দেশীয় স্রোতে কেহ বা বিলাতী স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে তদনুযায়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি উদিত হয় না; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে পবিত্র "ধর্ম্মের" নামে ভূমণ্ডল প্লাবিত হইয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে "স্বাধীনতার" পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতা ফ্রান্স প্রভৃতি কতদেশে রাজত্ব করিয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য জাতিদিগকে "সভ্য" করিবার ছলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি সক্রেটিস্ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আথেন্স মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিয়া যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতি-গর্ব্বিত উনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থের আভাস কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে "পক্ষী" শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং "উরগ" বলিতে বুকের উপর

ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে "সভ্যতা" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে সমাজ বাচক "সভা" শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, যাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে "তৈল" বলিতে প্রথমে তিলের নির্য্যাস বুঝাইত; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিষার তৈল, বাদামের তৈল, মাস তৈল ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্য্যাস না বুঝাইয়া নানাপ্রকার নির্য্যাস বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে "অম্লজান" শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অম্ল উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই "অম্লজান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে এমন অনেক অম্ল আছে যাহাতে উক্ত অম্লজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া "অম্লজান" শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার দোহনবোধক দুহ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহুসন্তানসত্ত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনামপ্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি; সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্রিত হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বাহুল্য অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপলক্ষ ব্যতিরেকে অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকে একত্র হইয়া থাকিতে ভালবাসে না; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাপ্রবৃত্তি বলবতী,

পরস্পার পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় স্থূল বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বত্বরক্ষা জন্য আইনে, আদালত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

৪) পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজবন্ধনের সূত্রপাতমাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাঁহারা সামাজিক অবস্থার সর্ব্বোচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে সামাজিক ভাবের তারতম্যানুসারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায় একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসনসূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটী নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ তাহাতে অন্যের দুঃখ। এইরূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজবন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু যত সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম্ম নীতি ও নীতিসম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোকসাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বপ্রকৃতিমণ্ডলীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজমধ্যে কার্য্যবিভাগ আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রয়োজনমত সমুদয় কার্য্য করে। একই ব্যক্তি সূত্রধার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মৎস্যজীবী, শিকারী, গৃহনির্ম্মাতা, ইত্যাদি। ইহাতে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকে উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ

মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। এইরূপে পরস্পর সাপেক্ষতাগুণে কার্য্যবিভাগদ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্য্যবিভাগপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও মিসরে এইরূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশরক্ষা করিবেন। বৈশ্য বা বণিক্ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। শূদ্র বা দাস অন্য শ্রেণীর লোকের সেবা শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু এ গুলিও কেবল মোটামোটি বিভাগ। ভারতবর্ষে যে সকল বর্ণসঙ্কর জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্মকার, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী, ইত্যাদি। এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়। যে যাহা শিখিত আপন সন্তান সন্ততিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত। ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনটী অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; (২) অন্যশ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নূতন বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল; (৩) যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত তাহার পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এইরূপে যে সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতার গুণে কার্য্য বিভাগ প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঈদৃশ গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ এবং মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়তঃ,—সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে—পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থে একটী সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরুলতা পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, করুক। নিঃশব্দে বসন্ত বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণ-

প্রভাবে মহীরুহব্যূহের স্বনন শুনিয়া তদনুকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক। নীরব ভাবুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্যের সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিরূপে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয়ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্যের নিকটে অভাবপূরণার্থে মনের কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই; বাক্যদ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গ সঞ্চালনদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য, কিন্তু এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য সকল উত্তরকালবর্ত্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ—সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্যের দোষমার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা যেরূপ একটী সামাজিক গুণ, বিপন্নকে সাহায্য করাও তদ্রূপ আর একটী। ঘটনা-সূত্রে কত লোক বিপত্তি জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়া তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর সাপেক্ষতানুযায়ী কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা লাভ প্রত্যাশাই সমাজবন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ—সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই; একজনের বা এক অঙ্গের দুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষাজন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ যেখানে নাই, সেখানে সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের দুঃখে রাজপুরুষদিগের দুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ

রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদসংস্থাপননিবন্ধন একতাহ্রাস তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্র্যবিলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে, সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবনধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্য্যে দেহমন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টভক্ত দূরে এই "মিলিনিয়ম" দেখেন; দেখেন যে সমুদয় মনুষ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক পরিবারভুক্ত হইয়াছে এবং অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকার সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন যে, সমাজের উন্নতিসহকারে সর্ব্বহিতকরী নিঃস্বার্থপ্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্গিকনির্ব্বাচন প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূরবর্ত্তী নীহারিকাবৎ সামান্যদৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে, এখনকার সুসভ্য ভদ্রলোক হয়ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং সেই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না। যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ইত্যাদি; এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি কাল্ডিয়া,—কি ফ্রান্স, কি জর্ম্মণী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে দৃষ্ট হউক, সেই খানেই আমরা সভ্যতার

আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাল্মীকি, হোমার বা সেক্ষপিয়র,—গৌতম, আরিস্ততল, বা বেকন—আর্য্যভট্ট, টলেমি, বা নিউটন,—যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অন্য সাক্ষী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে সভ্যতা বলিতে কেবল "সামাজিক সম্বন্ধ বর্দ্ধনই" বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্টবৃত্তি সকলের উন্নতি-সাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন।

"যদিও সমাজ অন্যস্থানের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্যত্ব অধিকতর মহিমা ও প্রভাবসহকারে বিরাজমান। অনেক সামাজিক অধিকার বিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার বিস্তার ঘটিয়াছে; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্বল্যমান বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও শিল্প তাহাদিগের প্রভা বিকাশ করিতেছে। যেখানে মনুষ্যজাতি মানবপ্রকৃতির ঈদৃশ মহিমাপ্রদ এই সকল মুর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেই খানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে। *

মনুষ্য সভ্যতাবর্ত্মে যত অগ্রসর হইতেছে, ততই প্রকৃতিকে স্বীয় কর-তলস্থ করিতে পারিতেছে। মনুষ্যের যত জ্ঞান ও একতার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই জগতের উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব বাড়িতেছে। যে সকল নৈসর্গিক শক্তির সম্মুখে মূর্খ অসভ্যজাতি ভীত ও হতবুদ্ধি, বিদ্যালোকসম্পন্ন সভ্যজাতি বিজ্ঞান ও একতার বলে সে সকল শক্তিকে বশীভূত করিতে পারিতেছেন। সকৌশল ও সমবেত মানবচেষ্টায় হলণ্ডের ন্যায় নিম্ন দেশ সমুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইয়া মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে, বালুকাময় সুয়েজযোজক বাণিজ্যসুগমতাসম্পাদক পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়াছে, এবং দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস পর্ব্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীররূপ ধারণ করিয়াছে। দুস্তর জলনিধি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া যে সকল জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা জলযান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ

---

* Guizot's Civilization in Europe.

করিয়া পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করে। পুরাকালের অগ্নিদেব এখন মনুষ্যের পাচক ও যানবাহক, বায়ুদেব যন্ত্রপেষক ও যানবাহক, সূর্য্যদেব চিত্রকর, এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বিদ্যুৎ সংবাদতরঙ্গবাহিনী দাসী। কবি কল্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ রাবণের প্রতাপে তাহার সেবা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মনুষ্যের জ্ঞানপ্রভাবে দিক্‌পালদল সত্য সত্যই তাঁহার সেবা করিতেছে।

প্রসিদ্ধ ইংরেজলেখক বাকলি সাহেব বিবেচনা করেন যে ইউরোপ-খণ্ডের বাহিরে যে সকল প্রদেশ সভ্য হইয়াছে, সে সকল প্রদেশে মনুষ্য বাহ্য জগতের কর্ত্তা না হইয়া তাহার অধীন ছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ আছে, এবং এসিয়া ও আফ্রিকার অনেকস্থল হইতে সভ্যতা অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ দেখা যায় না যে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও অন্যস্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার প্রকৃতিগত বিভেদ আছে। যে হিন্দুরা ইলোরার পর্ব্বত কাটিয়া স্বর্গোপম কৈলাসসমন্বিত গিরিগহ্বরমালা প্রস্তুত করেন, যাঁহারা সঙ্কটসঙ্কুল সমুদ্র পার হইয়া সিংহল, বালি, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, যাঁহারা জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করেন, যাঁহারা এই বিশ্ব-মণ্ডলের সৃষ্টিসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত উদ্ভাবন করেন, তাঁহারা যে নৈসর্গিক শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া তদনুবর্ত্তী হইতেন, এমন বোধ হয় না; বরং ঋষিদিগের মধ্যে জগদ্বশীকরণের ইচ্ছা প্রবল দেখা যায়। এতদ্দেশে এবং চীনে সামাজিক অবস্থা বহুকাল একরূপ থাকিবার কারণ বোধ হয় এই; যৎকালে ভারতবর্ষের ও চীনের লোকেরা সভ্য হন, তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীরা এত অসভ্য ছিল যে, তাহাদিগের সহিত তুল-নায় স্বদেশ প্রচলিত মত ও অনুষ্ঠানগুলির প্রতি তাঁহাদিগের অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই বহুকাল তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন নাই। কোন কোন রাজ্য বা জাতির পতন সংঘটনদ্বারা এসিয়া ও আফ্রিকার অনেক স্থানে সভ্যতার তিরোভাব বা হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বিপ্লব প্রায় সামাজিক কারণের ফল। প্রাচীন রাজ্যমাত্রেই বহুসংখ্যক দাস ছিল। যাঁহাদিগের হাতে আধিপত্য ছিল, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক। এই উভয়ের মধ্যে পীড়িত ও

পীড়ক প্রায় সর্ব্বত্রই এই সম্বন্ধ ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেখানে এ প্রকার গৃহবিচ্ছেদ সেখানে সমাজ স্থায়ী হইতে পারে না। ঈদৃশ অবস্থায় বিষময় ফল সর্ব্বত্রই ফলিবে, ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা যেখানেই হউক না কেন। যেমন আফ্রিকায় মিসরের, এসিয়ায় বাবিলন প্রভৃতির, তেমনই ইউরোপে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পতন ঘটিয়াছে। সত্য বটে, গ্রীস ও রোম পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া গিয়াছে। রোম তাহার আইন, গ্রীস তাহার বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য জগতের মঙ্গলসাধনার্থে রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা কম নহে। ভারতবর্ষ প্রেমময় বৌদ্ধধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতবর্ষ আরবদিগকে দিয়া স্বীয় পাটীগণিত, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি ও রসায়ন ইউরোপখণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় বৈয়াকরণদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই ভাষাতত্ত্ববিদ্যার মূল পত্তন হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রকৃতির শক্তি, আদৌ প্রবল হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধিসহকারে ক্রমশঃ কমিয়া যায়, যদিও উহা একেবারে শূন্যবৎ বা অগ্রাহ্য হইবার নহে। আদিম মনুষ্য, নিকৃষ্ট জীবগণের ন্যায়, নৈসর্গিকনির্ব্বাচনস্রোতের বশবর্ত্তী ছিলেন। সেই আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করিতে হয় এবং তাহা কি কাজে লাগে কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদিগের দেহ আবরণ করিবার বস্ত্র ছিল না; এবং আশ্রয় লইবার আবাসগৃহ ছিল না। তাঁহারা যখন যেখানে থাকিতেন, তখন তত্রত্য স্বভাবজ ফল মূল আহরণ ও বন্যজীব হনন করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। তাঁহাদিগের ধাতুনির্ম্মিত কোন অস্ত্র ছিল না, এবং তাঁহারা কৃষিকার্য্যের কিছুই বুঝিতেন না। তাঁহাদিগকে সাহায্য করে এমন কোন সামাজিক সহযোগী বা পালিত জন্তু ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে তিনি যতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, উন্নত ভাষার অভাবে ততটুকু অন্যকে দিয়া যাইতে পারিতেন না। ঈদৃশ অসভ্য ব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের সম্বন্ধে বাহ্যশক্তির কার্য্য পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইতেন, এমন বোধ হয় না। এই নিমিত্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইত। পরিণামবাদী উয়ালেস সাহেব অনুমান করেন যে এইরূপেই বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। যে সময় হইতে মনুষ্যগণ

অগ্নি, বস্ত্র, গৃহ, খাদ্য প্রভৃতির গুণ অবগত হইয়া তৎসাহায্যে বহির্জগতের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া যে সে মণ্ডলে বাস করিতে শিখিল, সেই সময় হইতে এই সকল জাতীয় লক্ষণের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই কারণেই তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে সকল জাতির মূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অদ্যাপি চিনা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টিই প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। এতদ্দ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে ঐতিহাসিক প্রবাহের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। যদি সিন্ধুনদিতীরে বা গ্রীস দেশে কাফ্রি-জাতি বাস করিত, তাহারা যে আর্য্যজাতির ন্যায় সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রত্যয় হয় না। উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত জাতিসৃষ্টিব্যতীত, সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রকৃতি আর একদিকে অনুকূলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোকে অবসর না পাইলে মানসিক উন্নতি করিতে পারে না, এবং যেখানে স্বভাবতঃ ভূমি এত উর্ব্বরা যে অল্প পরিশ্রমেই পর্য্যাপ্ত আহার্য্য উৎপন্ন হয়, সেখানে সহজেই অবসর মিলে। এই কারণেই অতি প্রাচীনকালে নীল, ইউফ্রেতিস্ ও সিন্ধুনদের তীরে সভ্যতার আবির্ভাব। কিন্তু যদিও এইরূপে বাহ্যবস্তুর প্রভাব সভ্যতার উদয়ের সহায় হইয়া থাকে, তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও সমাজের নিয়ম অবগত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে শিখে, সেই পরিমাণে আপনাদিগের অবস্থা উন্নত করিয়া সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে।

আমরা দেখিয়াছি যে সভ্যতার ত্রিবিধ মূর্ত্তি, সামাজিক বা নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও বাহ্যিক। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত আমাদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিষয় আমাদিগের যে প্রকার জ্ঞান, নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের উপর আমাদিগের যে প্রকার কর্তৃত্ব, তদ্দ্বারাই আমাদিগের সভ্যতার পরিমাণ নির্ণীত হয়। ধর্ম্মের মহৎক্রিয়া, বিজ্ঞানের ভবিষ্যদ্বাণী ও শিল্পের অধিকার বিস্তার, এ সকল সভ্যতার উন্নতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড স্বরূপ। কিন্তু আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির কার্য্য-প্রণালী জানিতে পারি, সেই পরিমাণেই আমরা তাহার উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। আমাদিগের সামাজিক কার্য্যও বিশ্বাসের অনুগত এবং নূতন কিছু না জানিলেও বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং বাহ্য-জগতের উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি উভয়ই জ্ঞানোন্নতিসাপেক্ষ।

এই নিমিত্ত যাঁহারা কোন দেশে সভ্যতা বৃদ্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হন।

আদিম মনুষ্য যে ঘোর অসভ্য ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক কয়েকখানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে মনুষ্যের ক্রমশঃ উন্নতি না হইয়া অবনতি হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুদিগের "সত্যযুগের", গ্রীক্‌দিগের "স্বর্ণযুগের", এবং য়ীহুদীদিগের "নন্দনোদ্যানের" উল্লেখ করিয়া আপনাদিগের মত সমর্থন করিতে চাহেন। এ প্রকার তর্ক সম্বন্ধে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে পূর্ব্বকালীন হিন্দু, গ্রীক্ ও য়ীহুদীদিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল সত্য; কিন্তু বোধ হয় আদিম কালের প্রকৃত ইতিবৃত্তের অভাবে অনুমানের সাহায্যে অতীতের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে গিয়া তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে বিজ্ঞতা ও তপস্বীভাব প্রাচীনকালের প্রতি আরোপ করিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, আসিরিয়া, গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যজাতিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ আপন আপন সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণের ইতিবৃত্তও এই প্রকার। অদ্যাপি পৃথিবীতে এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এখনও প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে, যাহারা এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে পারে নাই, এবং যাহারা এখনও বিবাহবন্ধন জানে না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা দেখাইতেছে যে মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরাস্ত্র পরে তাম্র, পিত্তল বা কাংস্যনির্ম্মিত অস্ত্র, এবং পরিশেষে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্যাও ক্রমোন্নতির সাক্ষ্য প্রদান করে। যে সকল শব্দ এক্ষণে উন্নত মানসিক ভাববোধক, সে সকল আদৌ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থবাচক ছিল। এইরূপে চারিদিকে উন্নতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রত্যক্ষকে সকল জ্ঞানের মূল বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে একটী মঙ্গলকর তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে মানব সমাজের কতকালের পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং কত আস্তে আস্তে মনুষ্যের উন্নতি হইয়াছে। সত্য বটে, সময় বিশেষ বা দেশ বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কোন স্থলে অবনতি দেখিতে পাই; কিন্তু কিঞ্চিৎ অধিককাল ব্যবধানে সমগ্র মানব

জাতির প্রতি নেত্র নিক্ষেপ করিলে উন্নতিই দৃষ্ট হয়। জাতিবিশেষের উদয়াস্ত আছে, কিন্তু এক জাতির হস্ত হইতে অপর জাতি উন্নতিনিশান গ্রহণ করিয়া নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন নেতা ভারতবর্ষ, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের প্রাচীন নেতা মিসর। মিসরের হস্ত হইতে পশ্চিমের নেতৃত্বভার ক্রমে ক্রমে ফিনিসিয়া, গ্রীস ও রোমের হাতে যায়। পরে আরবেরা ইউরোপ ও ভারতবর্ষ উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় খণ্ডের নেতা হয়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিগণ এক্ষণে আমাদিগের পদে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান বিষয়ে প্রাচীন সমুদয় জাতি অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। সমাজনীতিসম্বন্ধে তাঁহাদিগের পণ্ডিতগণের মতগুলি প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে; কিন্তু এই মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাদিগের যে কতকাল লাগিবে বলা যায় না। এই কারণেই বলি যে সভ্যতার চরমসীমা হইতে তাঁহারা অদ্যাপি অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।

সমাজ বিজ্ঞান। *

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "বর্ত্তমান কালের প্রধান লক্ষণ কি, আমরা বলিব বিজ্ঞানের সধিকারবিস্তার। ব্রহ্মাণ্ডের সকল কাণ্ডেই এক্ষণে বিজ্ঞান হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সমস্ত বস্তু অতি ক্ষুদ্র বলিয়া চক্ষুর অগোচর, বিজ্ঞান অণুবীক্ষণযোগে তাহা আপনার আয়ত্ত করিতেছে। যে সকল পদার্থ অতি দূরবর্ত্তী বলিয়া অলক্ষ্য বা দুর্লক্ষ্য, বিজ্ঞান দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা আপনার শাসনাধীনে আনিতেছে। এইরূপে ভূমণ্ডল ও আকাশ হইতে দেবতা তাড়াইয়া সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান আপনার রাজ্য বাড়াইতেছে। পূর্ব্বে যে ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের বিশৃঙ্খল ব্যাপারে ইন্দ্র ও বায়ুর প্রভাব অথবা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ লক্ষিত হইত, তাপতাড়িতের দুটী কথা বলিয়া বিজ্ঞান তাহা নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। পূর্ব্বে যে ধূমকেতু দেবক্রোধ-চিহ্নস্বরূপ গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে অমঙ্গল বর্ষণ করিত, বিজ্ঞান মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু দিয়া তাহাকে সূর্য্যের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে রুদ্রমূর্ত্তি

* বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮১।

সর্ব্বভুক্ হুতাশন দৃষ্ট হইতেন, সেখানে বিজ্ঞান রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ প্রদর্শন করিতেছে। পূর্ব্বে যে প্রাণরূপ স্বতন্ত্র পদার্থ জীবোদ্ভিদসমূহের শরীরে থাকিয়া তথাকার কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিত, বিজ্ঞান তাহাকে উড়াইয়া দিয়া তাহার অধিষ্ঠান ভূমিতে নৈসর্গিক নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছে। এমন কি কিরূপে বর্ত্তমান জগতের ও জীবপুঞ্জের উৎপত্তি হইয়াছে, বিজ্ঞান তাহাও দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। কি প্রকারে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ধূমকেতুগণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, কি প্রকারে জলস্থল পর্ব্বত নদী প্রভৃতি তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, কি প্রকারে ভূমণ্ডলে নানাবিধ জীবের উদয়, বিলয় বা বিস্তার ঘটিয়াছে, বিজ্ঞান যুক্তিসহকারে বুঝাইয়া দিতে প্রস্তুত। এই বৃহৎ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া বিজ্ঞান ঐশীশক্তির সাহায্য চাহে না, সৃষ্টি কল্পনা করে না, কেবল প্রাকৃতিক কার্য্যপ্রণালীর কথা বলে। এই কার্য্যপ্রণালীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বিজ্ঞান বিদ্যুৎকে দূত করিয়াছে, অগ্নিকে রথের অশ্ব করিয়াছে, সমুদ্রকে গমনাগমনের পথ করিয়াছে, এবং বায়ুকে প্রয়োজনানুসারে বাহন করিয়া থাকে।

কার্য্যকারণসূত্র ধরিয়া বিজ্ঞান জগন্মণ্ডলে সর্ব্বত্রই নিয়মের আধিপত্য সংস্থাপন করিতেছে; এক্ষণে মনুষ্যসমাজকেও ছাড়িতেছে না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে মানবজাতিও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে গ্রথিত, মানবজাতিও নিয়মের অধীন। যেমন চরণতলস্থ ধূলিকণা হইতে দূরবর্ত্তী নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যন্ত জড়পদার্থসকল নিয়মের অধীন, তেমনই বিজ্ঞানবেত্তৃগণের মতে তরুলতার অঙ্কুর হইতে মনুষ্যমনের মহোচ্চতমচিন্তা পর্য্যন্ত প্রাণিমণ্ডলস্থ সমস্ত ব্যাপারই নিয়মের অধীন। কিন্তু ইহার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, আমরা ত আপনাদিগকে এ প্রকার আবদ্ধ বিবেচনা করি না; আমাদিগের অনুভব ও বিশ্বাস এই যে, আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আমাদিগের কার্য্যে এইরূপ বিশ্বাসই সর্ব্বদা প্রকাশ পায়। যখন আমরা কোন মন্দ কর্ম্ম করি, তজ্জন্য আমাদের চিত্তে অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমরা অবশ্যই ভাবি যে উক্ত কর্ম্ম করা না করা উভয়ই আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত ছিল; ইচ্ছাপূর্ব্বক অবৈধ আচরণ করিয়াছি বলিয়াই মনস্তাপ জন্মে। যদি আমরা বুঝিতাম যে, যে কার্য্য করিয়াছি, তদ্বিরুদ্ধে ধাবিত হইবার শক্তি আমাদিগের ছিল না,

তাহা হইলে আমাদিগের ঈদৃশ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত না। বাস্তবিক যখন আমাদিগের স্বাধীনতা থাকে না, যদি আমাদিগের দ্বারা কেহ একটি অন্যায় কার্য্যও করাইয়া লয়, আমরা তজ্জন্য বিশেষ কোন মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করি না। যদি ডাকাইতে কাহাকে বাঁধিয়া অন্য একজনের উপরে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দিয়াছি বলিয়া সন্তপ্তচিত্ত হয়, এরূপ বোধ হয় না। আর সৎকর্ম্ম করিলে আমরা যে আত্মপ্রসাদ পাই, অসৎপথে যাইবার ক্ষমতা আমাদিগের ছিল, এ প্রকার প্রত্যয় না থাকিলে তাহা কখনই জন্মিত না। অন্য লোককে যখন আমরা তাহাদিগের কার্য্য জন্য নিন্দা বা প্রশংসা, পুরস্কার বা তিরস্কার করি তখনও আমরা তাহাকে স্বাধীন জ্ঞান করি; কারণ, বিপরীত ব্যবহার তৎপক্ষে সম্ভব না হইলে তাহার প্রতি দোষ বা গুণের আরোপ নিতান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে। যখন আমরা কোন অপরাধীকে দণ্ড দিয়া থাকি, তখনও আমরা বিবেচনা করি যে, সে অন্যরূপ কার্য্য করিতে পারিত, কোন অনিবার্য্যশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহার এ প্রকার আন্তরিক বল ছিল যে সে অসৎবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্মার্গানুগামী হইতে পারিত।

এই আপত্তিগুলির সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে গুটিকতক কথা বলিব। অনুভব দ্বারা আমরা আপন আপন বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা জানিতে পারি। আমাদিগের মনে কি প্রকার সুখ, দুঃখ, বাসনা, ইচ্ছা বা জ্ঞান এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে, আমরা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু কোন প্রকার মানসিক শক্তি অনুভবের বিষয় নহে, অনুমানের বিষয়। আমাদিগের মনে যে সকল ভাব উদিত হয়, তন্মধ্যে এক এক জাতীয় ভাবদিগকে এক একটী শক্তির কার্য্য বলিয়া আমরা অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং যদি আমাদিগের কার্য্যনিয়ন্ত্রী স্বাধীনতাশক্তি থাকে, তাহা অনুভবসিদ্ধ না হইয়া অনুমানসিদ্ধ হইবে। অনুমান অবলম্বন করিয়াই, আমাদিগের কোনপ্রকার ক্ষমতা আছে না আছে, তদ্বিষয়ের বিশ্বাস জন্মে। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদিগের যে স্বাধীনতায় বিশ্বাস আছে, সে কিরূপ স্বাধীনতা। সাধ্যবিষয়ান্তর্গত যখন আমাদিগের যাহা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা করিতে পাইলেই আমরা আমাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি। যদি কেহ আমাদিগকে ধরিয়া, বাঁধিয়া বা আবদ্ধ করিয়া রাখে,

যদি ইচ্ছামত আমরা বিচরণ করিতে না পারি, যদি ইচ্ছানুসারে লিখিতে, পড়িতে, বলিতে বা অন্য কোনরূপ কার্য্য করিতে না পাই, তাহা হইলে আর আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন জ্ঞান করি না। ইহাতেই স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, যখন কোন বাহ্যশক্তিতে আমাদিগকে ইচ্ছানুসারে চলিতে দেয় না, তখনই আমরা আপনাদিগকে পরাধীন ভাবি; আর যখন আমরা আপন আপন ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে পাই, তখনই আমরা আপনাদিগকে স্বাধীন বিবেচনা করি। আমরা স্বাধীন একথা বলিবার সময় আমাদিগের ইচ্ছার কোন কারণ নাই, ইহা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। তবে হয়ত ইহার অন্তরে এই ভাবটি আছে আমরা কোন অনিবার্য্য বাহ্যশক্তির বশীভূত হইয়া ইচ্ছাটিও করি না, স্বীয় প্রকৃতি অনুসারেই করিয়া থাকি। স্বাধীনতা শব্দের অর্থই স্বপ্রকৃতি সাপেক্ষতা, স্বস্বভাবানুবর্ত্তিতা।

অসৎকর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি কেন হয় তাহার কারণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। কি করা ভাল, কি করা মন্দ, প্রত্যেক ব্যক্তিই একপ্রকার স্থির করিয়া রাখে। কিন্তু সময়ে সময়ে কোন বাসনা প্রবল হইয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান ঢাকিয়া ফেলে। তখন অন্যায় কার্য্য সহজেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যখন আন্তরিক ঝটিকা থামিয়া যায়, তখন স্থির বুদ্ধির আলোকে উক্ত কার্য্যের মলিনত্ব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। তখন উচ্চলক্ষ্যচ্যুত ও নীচ পথগামী বলিয়া আপনার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মে। নিজের প্রতি অতিশয় অশ্রদ্ধা হইলে মনে অত্যন্ত কষ্ট হইবারই কথা।

আমরা সকল লোকের কার্য্য দেখিয়া যে তাহাদিগের নিন্দা বা প্রশংসা, দণ্ড বা পুরস্কার করি, ইহা হইতে তাহাদিগের ইচ্ছা কার্য্যকারণনিয়মের অধীন নহে এরূপ বিবেচনা করা অন্যায়। মনে কর যদি পৃথিবীতে এমন একজাতীয় জীব থাকিত, যাহারা অনিবার্য্য বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমাগতই আমাদিগের উপকার করিত ও অপকার করা কাহাকে বলে বুঝিত না, তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে দেবতাতুল্য ভাবিয়া ভক্তি করিতাম না? আর যদি কোন এক জাতীয় জীব স্বকার্য্যের ফলাফলবোধশূন্য হইয়া নিয়তই আমাদিগের অপকার করিত, তাহা হইলে কি আমরা তাহাদিগকে সর্প ও ব্যাঘ্রের ন্যায় বধ করিতে প্রস্তুত হইতাম না? বাস্তবিক বোধ হয় নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, পুরস্কার, এ সকলের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি; ১ আত্মরক্ষা, ২ সৎপ্রবৃত্তিবর্দ্ধন। যে ব্যক্তি আমাদিগের অনিষ্টসম্পাদনে নিযুক্ত, সে ব্যক্তি কালের

ন্যায় বোধশূন্য হইলেও আমরা তাহাকে দণ্ড দিতে পারি। এই কারণেই আমরা উন্মত্তদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত জ্ঞান করি। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, নিন্দা, প্রশংসা, দণ্ড, পুরস্কার দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত ও অসৎপ্রবৃত্তি নিবারিত হয়। এ বিশ্বাস সমূলক হইলে, নিন্দা প্রভৃতি দ্বারা মানবচিত্তের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং মনুষ্যকে কার্য্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিতে হইতেছে।

মনুষ্য কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন, ইহা পদে পদে আমরা অনুমান করি। যখন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, অমুক ব্যক্তি পারে না, তখন আমাদিগের মনোগত ভাব কি? তখন কি আমরা ইহাই ধরিয়া লই না যে প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যই তাহার চরিত্র ও অবস্থার সমবেত ফল? হাজার টাকা উৎকোচ পাইলে অর্থলোভী ও ন্যায়পর এ উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ কার্য্য করিবে, আমরা কি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বলিয়া দিতে পারি না? যদি গণনা ঠিক না হয়, তাহা হইলে কি আমরা বুঝি না যে চরিত্র ভাল করিয়া না জানাই আমাদিগের বিফল হইবার কারণ? আমরা কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইলে লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া চলি। কাহারও নিকট অনুনয় বিনয় করি। কাহারও কাছে তর্জ্জন গর্জ্জন করি। কাহাকে তাহার স্বার্থের কথা বলি। কাহাকে বা ধর্ম্মভয় দেখাই। কাহারও যশোলিপ্সা প্রজ্বলিত করি, কাহারও আত্মগরিমার বিনোদন করি। এইরূপে আমরা ব্যবহারে দেখাইতেছি যে, লোকের কার্য্য, অবস্থাসংযোগে স্বভাবোৎপন্ন ফল, ইহাই আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

জর্ম্মনদিগকে অনেকে চিন্তামগ্ন বলিয়া বৈষয়িকব্যাপারে অপারগ জ্ঞান করিত। অনেকে ভাবিত তাহারা দর্শন ও কাব্যরসে চিরদিন ডুবিয়া থাকিবে; কিন্তু পৃথিবীতে কখনও সমরকুশল ও মন্ত্রণাতৎপর পরাক্রান্ত জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না। এক্ষণে তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া লোকের এ প্রকার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কার্য্যকারণনিয়মের ব্যভিচার হইতেছে না। ইহাতে দেখাইতেছে যে পূর্ব্বে অনেক লোকে জর্ম্মনদিগের প্রকৃতি ভাল করিয়া অবগত হইতে পারে নাই।

মনুষ্যসমাজ যে নিয়মের অধীন তাহার একটি সুন্দর প্রমাণ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এক্ষণে অনেক প্রকার

ঘটনার বিশেষ বিশেষ তালিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, যে সকল কার্য্যে লোকের বিশেষ স্বাধীনতা অনুমিত হইয়া থাকে, তাহাতেও নিয়ম আছে। কোন্ দেশে বৎসরে কত বিবাহ, কত নর-হত্যা, কত চিঠিলেখা হইবে, এসকল এক প্রকার স্থির আছে। এমন কি, কত লোকে চিঠির শিরোনামায় মোকাম লিখিতে ভুলিবে, তাহাও অবধারিত করিয়া বলা যায়। বাস্তবিক সামাজিক অবস্থা যতদিন একরূপ থাকে ততদিন গড়পড়তায় ফল একরূপ হইবে, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

মনুষ্যের ইচ্ছা কারণসূত্রে বদ্ধ, ইহা বলিলে যদি কেহ দুঃখিত হন, কি করিব? জনমনোমোহন চিত্র অপেক্ষা সত্য আমাদিগের প্রিয়বস্তু। কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের মহত্ত্ব বাড়াইতে গিয়া, আমরা সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কিন্তু যাঁহারা ভাবেন যে অকারণে মনুষ্য যাহা তাহা ইচ্ছা করিতে পারে, তাঁহাদিগকে আমরা দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। লোকের সৎ বা অসৎ অভিপ্রায় দেখিয়াই আমরা তাহা-দিগকে প্রশংসা বা নিন্দা করি। অভিপ্রায়ানুবর্ত্তী ইচ্ছার কারণ স্পষ্টই উক্ত অভিপ্রায়। সুতরাং সে ইচ্ছা কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ। যে ইচ্ছার কারণ নাই, তাহাকে কিরূপে অসৎ বা সৎ বলিয়া তাহার নিন্দা বা প্রশংসা করিবে।

মনুষ্যসমাজ যদিও নিয়মের অধীন, তথাপি তাহা কতদূর বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথবর্ত্তী, ইহা অনেকে বুঝেন না। অনেকে মনে করেন, আমি, তুমি, বা অপর কোন ব্যক্তি সারাজীবন কখন কি কাজ করিব, বিজ্ঞান কালে বলিতে পারিবে। এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যদি একখানি কাচপাত্র প্রস্তরের উপরে সবলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে কাচপাত্রটী খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে, পদার্থতত্ত্ব বলিতে পারে; কিন্তু কোন্ খণ্ড কোথায় কিরূপ বেগে যাইয়া পড়িবে ইহা বলা বিজ্ঞানের সাধ্য নহে। সেইরূপ মনুষ্যসমাজের সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুই চারিটী কথা বলা যাইতে পারে; কিন্তু তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের জীবনগতি নির্ণয় করা বিজ্ঞানের ক্ষমতাতীত।

যে জ্যোতিষে বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহাতে বিজ্ঞান ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বহু কাল পূর্ব্ব হইতে সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ বা গ্রহবিশেষের অবস্থান গণনা করিতে সক্ষম, এমন কি

যাহাতে বিজ্ঞান না দেখিয়া অনুমান বলে বলিতে পারিয়াছে গগনের অমুক স্থানে অনুসন্ধান কর, একটী নূতন গ্রহ পাইবে, সেই জ্যোতিষেও বিজ্ঞান ঠিক ঠিক ফল নির্ণয় করিতে পারে না। গ্রহদিগের কক্ষগুলি ঠিক কেপ্‌লার্ (Kepler) নির্দ্দিষ্ট বৃত্তাভাস পথ নহে; অপর গ্রহসমুদায়ের আকর্ষণে প্রত্যেক গ্রহের কক্ষ শুদ্ধবৃত্তাভাস আকার প্রাপ্ত হইতে পারে না। বাস্তবিক জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা পরস্পর আকর্ষণকারী তিনটি পদার্থের প্রকৃত অবস্থানও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে আমরা নিরূপণ করিতে অশক্ত। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, বিষয়ের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বনির্ণয়ের কত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। মনুষ্যসমাজ একেত অসংখ্যব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, তাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি আবার বিবিধ বাসনার বশবর্ত্তী। একমাত্র মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাধীন তিনটী পদার্থের কক্ষ কয়টী ঠিক ঠিক নিরূপণ করা যখন অসাধ্য ব্যাপার, তখন বহুবিধবাসনাজড়িত বহুসংখ্যক ব্যক্তিবর্গের গতি স্থির করা সহজ কাণ্ড নহে। বিশেষতঃ দেশ, কাল ও অবস্থাভেদে মনুষ্যের কতরূপ প্রকৃতিভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার উপর আবার ভাবিতে হয় যে, মানবজাতি প্রায় লক্ষবৎসর ভূমণ্ডলের অধিবাসী; অথচ আমরা কেবল দুই তিন হাজার বৎসরের কোন কোন দেশের ইতিহাস মাত্র জানি। সাগরকূলের দুই একটী ঢেউ দেখিয়া কেহ অকূল জলধির বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তাহার যে দশা হয়, সমুদয় মানবজাতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে আমাদিগের প্রায় সেইরূপ দশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। যদি আমরা পুরাণবর্ণিত ঋষিগনের ন্যায় ত্রিকালজ্ঞ হইতাম, তাহা হইলেও একপ্রকার নিস্তার ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা কলিকালের লোক। সামান্য বুদ্ধিরূপ ভেলা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে অনন্ত অম্বুনিধি অতিক্রম নিমিত্ত অগ্রসর হইতে হয়।

পদার্থভেদে তন্নির্ম্মিত স্তূপের আকার ভেদ ঘটে। গোলক, ইষ্টক বা বালুকা, রাশীকৃত করিয়া সাজাও, স্তূপগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহাদিগের গঠনবন্ধনও বিভিন্নরূপ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইবে। এই সামান্য উদাহরণ হইতেই বুঝা যাইতেছে যে সমষ্টির প্রকৃতি উপাদানসাপেক্ষ। মানবসমাজও এই নিয়মের অধীন। মনুষ্যের স্বভাব দেখিয়াই মানবসমাজের ভাবগতি নির্ণেয়।

যখন কোন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বল প্রয়োগ করা যায়, তখন হয় তাহা

স্থির হইয়া থাকিবে, নয় তাহার গতি হইবে। পণ্ডিতেরা এ নিমিত্ত বল-বিজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন; ১ স্থিতিবিজ্ঞান, ২ গতিবিজ্ঞান। স্থিতিবিজ্ঞানে স্থিতির, এবং গতিবিজ্ঞানে গতির নিয়ম সকল নির্ণীত হয়। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞান ও সামাজিক গতিবিজ্ঞান নামক সমাজবিজ্ঞানের দুইটী শাখা কল্পনা করিয়াছেন। সামাজিক স্থিতিবিজ্ঞানে সমাজস্থিতির, এবং সামাজিক গতিবিজ্ঞানে সামাজিক উন্নতির নিয়মাবলী নিরূপিত হয়।

সমাজস্থিতির নিয়মাবলী নির্ণয় করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা মানবসমাজকে শরীরের সহিত তুলনা করেন। শরীরের সমুদায় অংশগুলি পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে যেমন স্নায়ুমণ্ডল আছে, তেমনই সমাজে শাসনকর্ত্তা চাই। ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক যন্ত্র দ্বারা যেমন শরীরক্ষণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদিত হয়, তেমনই সমাজরক্ষার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়িলোক সমাজে থাকা আবশ্যক। যেমন শরীরের এক অঙ্গে বেদনা লাগিলে সমু-দায় শরীরের ক্লেশবোধ হয়, তেমনই সমাজের কাহারও দুঃখ হইলে অন্যের সহানুভূতি চাই। যেমন শরীরস্থ এক অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গের সহায়তা হয়, তেমনই সমাজের এক ব্যক্তি বা একবিভাগ দ্বারা অপর ব্যক্তি বা অপর বিভাগের সাহায্য হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক যে যে স্থলে সমাজ ক্ষমতাশালী ও সুখী দেখা যায়, সে সে স্থলে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধেয় শাসন প্রণালী আছে, সেখানে প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্নপ্রকার ব্যবসায়ী লোক আছে, এবং সেখানে পরস্পরের সাহায্য করা ও পরস্পরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। যদিও শরীরের সহিত সমাজের এত সাদৃশ্য, তথাপি উভয়ের মধ্যে একটী গুরুতর বিভেদ আছে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই চৈতন্যবিশিষ্ট জীব, কিন্তু শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ তদ্রূপ নহে। সুতরাং সমাজস্থ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের স্বচ্ছন্দতাসম্পাদনই সমাজরক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাপেক্ষা স্নায়ুমণ্ডলের স্বচ্ছন্দতাসম্পাদনই শরীররক্ষার প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে শাসনকর্ত্তৃগণ সমাজশরীরের স্নায়ুমণ্ডল স্বরূপ হইলেও রাজার সুখাপেক্ষা প্রজাদিগের সুখের দিকে দৃষ্টি রাখাই রাজ্যশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজের উপাদানভূত ব্যক্তিগণ সচেতন হওয়াতে আর একটী বিশেষ ফল এই হইয়াছে যে, শারীরিক কার্য্যাপেক্ষা সামাজিক কার্য্য অধিক পরিমাণে জ্ঞান ও ইচ্ছার অনুবর্ত্তী।

মনুষ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, উহা ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; প্রথম জ্ঞানের উন্নতি, দ্বিতীয় নীতির উন্নতি, তৃতীয় বাহ্য-জগতের উপর কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধি। যখন আমরা কোন জাতিকে পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলি, তখন হয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে নূতন কথা অনেক জানিয়াছে, নয় তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সৎকার্য্যশালী হইয়াছে, অথবা তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা জড়পদার্থ সকল আপনাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া তদ্দ্বারা সামাজিক সুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি করিয়াছে, এইরূপ কোন একটী বা দুই তিনটীর প্রতি লক্ষ্য করি। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে অপর দুই প্রকার উন্নতি জ্ঞানোন্নতি-সাপেক্ষ। জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বাহ্য বস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারিলেই আমরা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি। যত দিন না লোকে জানিত বিদ্যুৎ কি পদার্থ, ততদিন তাহাকে ইচ্ছানুসারে আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারে নাই; কিন্তু এক্ষণে তাহার আবির্ভাবের নিয়ম অবগত হইয়া আমরা তার সংযোগে তদ্দ্বারা দূরে সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। অগ্নিকে প্রথমে লোকে দেবতা বলিয়া ভয় করিত, পরে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়া তদ্দ্বারা মানব জাতি কত কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অগ্নি অন্ন ব্যঞ্জন পাক করে। অগ্নি শীতকালে তাপ দিয়া থাকে। অগ্নি অন্ধকার হরণ করিয়া নিশাকালে আমাদিগের কত সাহায্য করে। অগ্নি মৃন্ময় পাত্র ও ইষ্টক পুড়াইয়া আমা-দিগের কত উপকার করে। অগ্নি জলকে বাষ্প করিয়া কলের নৌকা ও কলের গাড়ী চালায়। আবার দেখ বায়ুর গতি অবগত হইয়া তৎসাহায্যে মনুষ্য সমুদ্রপথে জাহাজ চালাইতেছে। এইরূপ পদে পদে দৃষ্ট হইবে যে জ্ঞানই নরজাতির কর্ত্তৃত্বের মূল এবং বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি না হইলে তাহার উপর কর্ত্তৃত্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। নৈতিক উন্নতি বিশ্বাসপরিবর্ত্তনসাপেক্ষ। কিন্তু নূতন কিছু না জানিলে লোকের বিশ্বাসপরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং নৈতিক উন্নতিও জ্ঞানোন্নতিসাপেক্ষ।

যদি জ্ঞানোন্নতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতির নিয়মই সামাজিক উন্নতির প্রধান নিয়ম হইবে; এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করে, সেইগুলি সামাজিক উন্নতিরও সহায় হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত অগোস্ত কোম্‌ত বলেন যে জ্ঞানোন্নতির তিনটি

সোপান আছে ১ পৌরাণিক, ২ দার্শনিক, ৩ বৈজ্ঞানিক; আর যে বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক সোপানে উত্তীর্ণ হয়। অদ্যাপি ইহার অতিরিক্ত উচ্চকথা আর কেহই বলিতে পারেন নাই; এবং ইহার সাহায্যে কোম্‌ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কোম্‌ত-দর্শন" নামক প্রবন্ধে একবার কোম্‌তের জ্ঞানোন্নতিবিষয়ক মতের আলোচনা করা গিয়াছে; তজ্জন্য এতৎ সম্বন্ধে এস্থলে আর অধিক লিখিত হইল না।

প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক কারণে বোধ হয় জ্ঞানোন্নতির অনেক সহায়তা করিয়াছিল। যে যে স্থলে ভূমির উর্ব্বরতাগুণে লোকে অল্প পরিশ্রমে আহারসামগ্রী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়া জ্ঞানচর্চ্চা জন্য অবসর পাইত, সেই সেই স্থলে পূর্ব্বকালে বহুল পরিমাণে সামাজিক উন্নতি হইয়াছিল দৃষ্ট হয়। মিসরের নীলনদ তীরে, তুরস্কের ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর কূলে, ভারতবর্ষের সপ্তসিন্ধু প্রদেশে, হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদী বিভূষিতা চীনদেশে, প্রাচীন সময়েই সভ্যতার জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছিল।

সময়ে সময়ে কোন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া জ্ঞানোন্নতির বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বুদ্ধ বা খৃষ্ট না জন্মিলে লোকের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরও কতকাল লাগিত, কে বলিতে পারে? যদি গালিলিও বা নিউটন না জন্মিতেন, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উন্নতি অল্প-কালমধ্যে এত হইত কি না সন্দেহ। কেহ কেহ বলেন যে মহাপুরুষেরা উচ্চ পর্ব্বতচূড়া স্বরূপ, উদয়োন্মুখ জ্ঞান সূর্য্যের আলোক তাঁহাদিগের মস্তকে আগে লাগিয়া উপত্যকা প্রদেশে প্রতিফলিত হয়, এই মাত্র। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা না আবির্ভূত হইলেও উপত্যকা প্রদেশ জ্ঞানরশ্মিদ্বারা আপনা আপনি অনতিবিলম্বেই আলোকিত হইত। ইহাতে আমরা সায় দিতে পারি না। সত্য বটে, কোন একটি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাহার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি বড় লোকে যত গুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম, বহুসংখ্যক সামান্য লোকে বহুকাল না খাটিলে ততগুলি আবিষ্কার করিতে পারে না, এবং কোন একটি মহত্তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে মনের যেরূপ মহত্ত্ব আবশ্যক, তাহা কখনও সামান্য লোকের হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমরা বলি যে, যে

প্রণালীতে জ্ঞানের উন্নতি হইবে যদিও তাহার অন্যথা হইতে পারে না, তথাপি মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব দ্বারা উন্নতির বেগের তারতম্য সংঘটিত হয়।

শাসনকর্ত্তৃগণ পুরস্কার বা দণ্ডদ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধির অনুকূল বা প্রতিকূল হইতে পারেন। সুতরাং সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগকে এক হাত গণিয়া চলি। যাঁহারা রাজনিয়ম দ্বারা জর্ম্মনির উন্নতি ও স্পেনের অবনতি নদর্শন করিয়াছেন, আমরা আশা করি যে তাঁহারা আমাদিগের সহিত একমত হইবেন।

মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ। *

মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া বাহ্য জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন। এখন তিনি অগ্নিকে পূজা করা দূরে থাক, তাহাকে পাচক ও পরিচারক করিয়া তুলিয়াছেন; তাহাকে দিয়া ভক্ষ্য প্রস্তুত করান, প্রয়োজনমত আলোক জ্বালান, কল ঘুরান, এমন কি গাড়ী ও নৌকা পর্য্যন্ত টানান। তাঁহার কৌশলে বায়ুও বশীভূত হইয়াছে। বায়ু এখন পেষণ যন্ত্র (১), জলযান ও ব্যোমযান চালাইতে নিযুক্ত। এদিকে দিবাকর চিত্রকরের কার্য্য পাইয়াছেন (২), এবং ইন্দ্রের প্রিয় বিদ্যুৎ মানব সন্তানের আদেশে দেশে দেশে সংবাদ বহিয়া বেড়াইতেছেন (৩)। বৃষ্টি সময়ে হউক বা না হউক, খাল ও কূপ খনন করিয়া ক্ষেত্রে সলিলসিঞ্চনের উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক মনুষ্য আবশ্যক শস্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোথায় তিনি পর্ব্বত কাটিয়া পথ করিতেছেন (৪), কোথাও সমুদ্র তাড়াইয়া বাস-

---

* বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮২।

Works consulted—Buckles' Works, Mahaffy's Lectures on Primitive Civilizations, Smith's History of Greece, &c.

(১) Wind Mill.

(২) Photograph.

(৩) Electric Telegraph.

(৪) Mont Cenis Tunnel.

স্থান করিতেছেন (৫), কোথাও শুষ্কস্থলে সাগর করিতেছেন (৬), কোথাও জলের নীচে রাস্তা করিতেছেন (৭)। উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সম্বলিত ভীষণ সিন্ধু সভ্য নরজাতির যাতায়াতের বর্ত্ম হইয়াছে। কি সূর্য্যসন্তপ্ত উষ্ণমণ্ডল, কি তুষারাবৃত হিমমণ্ডল, সর্ব্বত্রই বাসগৃহ, পরিধেয়, আহার সামগ্রী, ও বাতাতপ নিয়মিত করিয়া মনুষ্য সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতে সক্ষম হইতেছেন। তাঁহার প্রতাপে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল বিস্তীর্ণ ঘন বিজন কানন ভূমিতে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে সকলও বিলুপ্ত হইতেছে। অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, গো, মহিষ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পশু সকল মানবের দাস হইয়াছে; এবং যে সকল পক্ষী কোন-রূপে কার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইয়াছে, সে সকলও অনেক পরিমাণে মানুষের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের প্রভুত্ব বাড়িয়াছে। মানবগণ যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইতে পারিয়াছেন ততই বাহ্য পদার্থ সকল ইচ্ছার বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া জগতের সহিত মনুষ্যের যুদ্ধ চলিতেছে; আরও বহুকাল চলিবে। কিন্তু ক্রমে মনুষ্যের জয়লাভ ও অধিকার-বৃদ্ধি হইলেও বাহ্য জগৎ মানবজীবনের ঘটনাস্রোত বহুপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। মানবেতিহাসে বহির্জগতের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিব।

ভূমণ্ডলের পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, দেশবিশেষের অবস্থান, তথাকার শীতোষ্ণতা, ভূমির উর্ব্বরতা ও সাধারণ খাদ্যের সহিত অধিবাসীদিগের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ বাহ্য কারণগুলিও পরস্পর নিরপেক্ষ নহে। কোন দেশে যে প্রকার খাদ্য জন্মে, তাহা সেখানকার ভূমি ও শীতোষ্ণতা-সাপেক্ষ। শীতোষ্ণতাও দেশের অবস্থান-সাপেক্ষ। আমরা প্রথমে শীতোষ্ণতার কার্য্য প্রদর্শন করিব।

---

(৫) Holland.
(৬) Suez Canal.
(৭) Thames Tunnel and projected Gibraltar and Dover Tunnels.

শীতে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়; গ্রীষ্মে পরিশ্রম করিবার ইচ্ছা হয় না। ইহার কারণ আছে। শারীরিক কার্য্যসকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নিমিত্ত মনুষ্যশরীরে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাপ থাকা আবশ্যক। কিন্তু চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর তাপদ্বারা দৈহিক তাপের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ক্রমাগত শীতল বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ কমিয়া যায়, এবং ক্রমাগত উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। (৮) এই জন্য শীতপ্রধান প্রদেশে লোকে শরীরের নিয়মিত তাপ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়, কারণ যে কোন প্রকার শরীরসঞ্চালন দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্তই গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে পরিশ্রম করা কষ্টকর বোধ হয়। সুতরাং শীতোষ্ণতার তারতম্যানুসারে নিতান্ত সামান্য ফল ফলিতেছে না। শীতে মনুষ্যকে পরিশ্রমপ্রিয় করে; গ্রীষ্মে মনুষ্যকে অলস করে। শীতে মনুষ্যকে ক্রমাগত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি দেয়, গ্রীষ্মে মনুষ্যকে বিশ্রাম অন্বেষণ করিতে শিখায়। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, ইতিহাস পাঠ কর, এই কথার সত্যতা পদে পদে প্রতিপন্ন হইবে। ইউরোপ-খণ্ডের সহিত এসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রদেশ সকলের তুলনা কর। ইউরোপ পরিশ্রমের আকর, আফ্রিকা ও এসিয়া আলস্যের আবাস-ভূমি। লোকের পারলৌকিক বাঞ্ছাতেও বাহ্যজগতের ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাদিগের মোক্ষ নির্ব্বাণ বা লয়। ইউরোপের মোক্ষ অনন্ত উন্নতি।

অনেক সময় দেখা যায় যে, সমতল প্রদেশের অধিবাসীদিগের অপেক্ষা পর্ব্বতীয় প্রদেশের লোক শক্ত ও পরিশ্রমপ্রিয়। ইহারও কারণ সহজে বুঝা যায়। সমতল প্রদেশাপেক্ষা পর্ব্বতীয় প্রদেশ সকল উচ্চ বলিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল; সুতরাং তথাকার অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত পরিশ্রম-প্রিয় ও তন্নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত বলবান্ হইবার কথা। মিড্ (৯) ও পারসিক-দিগের যদিও ভাষা ও ধর্ম্ম এক ছিল, তথাপি সমতলপ্রদেশবাসী মিডেরা পরিশেষে পর্ব্বতীয় প্রদেশবাসী পারসিকদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশের প্রতি লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন কি?

---

(৮) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 429.

(৯) Medes.

বাঙ্গালির সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসীদিগের তুলনা কর। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষা অধিক শীত হয়, এখান অপেক্ষা তথায় অধিক কাল শীত থাকে। এখানকার লোক অপেক্ষা তাহারা শক্ত, সবল ও পরিশ্রমপ্রিয়। মহারাষ্ট্র পর্ব্বতীয় প্রদেশ, সেখানকার অধিবাসীরাও অপেক্ষাকৃত সাহসী ও পরিশ্রমী। (১০)

এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। শরীরে অধিক উত্তাপ লাগিলে শারীরিক জলীয় পদার্থ কিয়ৎ পরিমাণে বাষ্পাকারে দেহ হইতে নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে তাপও বহির্গত হয়। যদি চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে, তাহা হইলে দেহ হইতে বাষ্প নির্গমের বাধা জন্মে, সুতরাং তাপ নির্গমনেও প্রতিবন্ধকতা হয়। (১১) এই কারণে শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু মধ্যে যত তাপ সহ্য করা যায়, সজল ও উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে তত তাপ সহ্য করা যায় না। (১২) এই নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে যে সজল ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট দেশের অধিবাসীরা যেরূপ অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, শুষ্ক ও উত্তপ্ত বায়ু বিশিষ্ট প্রদেশ-বাসীরা সেরূপ নহে।

ভূমির উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে উত্তাপ ও জলের উপর নির্ভর করে। যে সকল দেশ উষ্ণ ও সলিলসিক্ত, সেই সকল দেশের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা; যেখানে এই দুইটীর মধ্যে একটীর অভাব আছে, অথবা যেখানে এই দুইটীর প্রয়োজনানুরূপ মিলন সংঘটিত হয় নাই, সেখানকার ভূমি অনুর্ব্বরা। এই কারণেই সপ্তসিন্ধু, অনুগঙ্গ প্রদেশ, নীলনদের তীর, ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস নদীর সন্নিহিত স্থান, উর্ব্বরতাজন্য প্রসিদ্ধ। এই কারণেই তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ও হিমমণ্ডলের অন্তর্গত স্থান সকল উর্ব্বরতা বিষয়ে নিকৃষ্ট। এক্ষণে বিবেচনা কর, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা তাপবৃদ্ধি-কারী দ্রব্য অধিক খাইতে ভালবাসিবে না; সুতরাং মাংস অপেক্ষা ফল-মূলই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকে তাপ-বৃদ্ধিকারী তৈলাক্ত অর্থাৎ বসাযুক্ত মাংস আহার করিতে অনুরাগ প্রকাশ

(১০) "The inhabitants of the dry countries in the north, which in winter are cold, are comparatively manly and active. The Mahrattas inhabiting a mountainous and unfertile region, are hardy and laborious." Elphinstone's History of India.

(১১) See Carpenter's Human Physiology, 6th Ed. p. 444.

(১২) Ibid p. 432.

করিবে। যে সকল মাদক দ্রব্যে শরীর উষ্ণ করে, সে সকলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশাপেক্ষা শীতপ্রধান দেশে প্রিয় পদার্থ হইবে। এতদ্দেশবাসীদিগের সহিত ইউরোপ খণ্ডের অধিবাসীদিগের তুলনা করিলেই, এ সকল কথার সত্যতা প্রতীতি হইবে। আবার মনে কর, যে উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত সুতরাং উর্ব্বরা, সেখানে অল্প পরিশ্রমেই আবশ্যক আহার্য্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন হইবে। এই কারণেও অল্প পরিশ্রমই লোকের অভ্যস্ত হইয়া যাইবে ও তাহাদিগের আলস্য বৃদ্ধি হইবে। শীতপ্রধান প্রদেশে ভূমির গুণে ভক্ষণীয় উদ্ভিদ্ সকল যে কেবল অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে; অধিবাসীরা মাংসপ্রিয় বলিয়া মৃগয়াপ্রিয় হইবে; সুতরাং অপেক্ষাকৃত সাহসী ও সবল হইবে। যদি কোন উষ্ণদেশ সলিলসিক্ত না হয় সে দেশের ভূমি উর্ব্বরা হইবে না; সুতরাং তথাকার লোকের অধিক পরিশ্রম ও যত্নসহকারে ভূমিকর্ষণ করিতে হইবে এবং অল্পজন্মা দেশে লব্ধ খাদ্য অপরের হস্ত হইতে রক্ষা কবিবার জন্যও অনেক প্রয়াস পাইতে হইবে। সুতরাং অধিবাসীরা শক্ত ও সবল হইবার কথা। ইহার দৃষ্টান্তস্থল আরব দেশ। আরব উষ্ণ দেশ বটে, কিন্তু সেখানে বড় জলকষ্ট। সেখানে বৃহৎ নদ, নদী, হ্রদ নাই। সুতরাং সেখানে উর্ব্বরা ভূমি প্রায় নাই। এজন্য ভক্ষ্য সংগ্রহ নিমিত্ত আরবদিগকে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এই কারণে তাহারা পরিশ্রমী, শক্ত ও সাহসী। আরবের বায়ু শুষ্ক; ইহা অন্য প্রকারেও অধিবাসীদিগের সৌভাগ্য বলিতে হইবে। ইহাতে সজল বায়ুবিশিষ্ট উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় আরবের শ্রমকাতরতা সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। স্থানমাহাত্ম্যে আরবের অধিবাসীরা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হওয়াতেই তাহারা এক সময়ে সিন্ধু নদ হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, ভারত মহাসাগর হইতে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত, মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। যেরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশে কখন কখন বহুদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ জলরাশি সঞ্চিত হইয়া থাকে, পরে সামান্য কারণে কোন দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রচণ্ডবেগে বহির্গত হয় ও অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ বহুকাল পর্য্যন্ত আরবে যে মানবশক্তি ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়াছিল, মহম্মদের আদেশে সনাতন ধর্ম্ম প্রচারার্থে সেই শক্তি একবার স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ভূমণ্ডল প্লাবিত করিতে সবেগে ছুটিয়াছিল। পারসিক সাম্রাজ্য ও পূর্ব্বরোমক সাম্রাজ্য তাহার

প্রভাবে বিলুপ্ত হয়। এসিয়ার পশ্চিমভাগ, আফ্রিকার উত্তর খণ্ড, ইউরোপের স্পেন ও পর্ত্তুগাল, অল্পদিনেই আরবদিগের করতলস্থ হয়। কে বলিবে এক বার জ্বলিয়া উঠিয়াই আরবের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে? এক্ষণে অগ্নিশিখা বা ধূম দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য; কিন্তু আগ্নেয়গিরি বহুকাল নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও কখন কখন আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে সকল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সলিলসিক্ত, সেখানকার ভূমি উর্ব্বরা, যথা নীলনদের উপত্যকা, ইউফ্রেটীস্ ও টাইগ্রীস্ নদীর তীরবর্ত্তী ভূমি, অন্তর্গঙ্গ প্রদেশ, সপ্তসিন্ধু ইত্যাদি। আফ্রিকার উত্তর পূর্ব্বাংশে মিসরদেশ দিয়া নীলনদ প্রবাহিত, নদের উভয়তীরেই কিয়দ্দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কয়েক ক্রোশ বিস্তৃত উপত্যকা। পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয় অতিক্রম করিলেই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও বালুকারাশি দৃষ্ট হইবে। মিসরে প্রায় বৃষ্টি হয় না। কেবল বর্ষাকালে নীল নদের জল বৃদ্ধি পাইয়া উপত্যকা প্রদেশ প্লাবিত করে, তাহাতেই ভূমির উর্ব্বরতা রক্ষা পায়। আষাঢ় মাস হইতে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়, শতদিন বৃদ্ধির সময়, এই সময়ে প্রায় ১৩।১৪ হাত জল বাড়ে। অনন্তর জল কমিতে থাকে, এবং প্রায় চারি মাসে নদের পূর্ব্বাবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। বর্ষার জল হইতে যে পলল পড়ে, তাহাতেই প্লাবিত ভূমি উর্ব্বরা হয়, এবং জল সরিতে সরিতেই মিসরবাসীরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করে। নীলনদ মিসরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া উত্তর সীমাপর্য্যন্ত যাইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছে। সুতরাং নীলনদের উপত্যকা সঙ্কীর্ণ হইলেও অতিদীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন। জলপথে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা। বৎসরের মধ্যে আট মাস উত্তর দিক্ হইতে বাতাস বহিতে থাকে, ইহাতে পালভরে স্রোতের প্রতিকূলে অনায়াসে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে যাওয়া যায়। স্রোতের সাহায্যে দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করাও সহজ। জলবায়ু সর্ব্বত্রই সমান। ভূমিকম্প প্রভৃতি ভয়ঙ্কর নৈসর্গিক ঘটনার উৎপাতও প্রায় নাই, পীরামিড প্রভৃতির রক্ষাই ইহার সামান্য প্রমাণ নহে। নদের জলপ্লাবনের গুণে উপত্যকা প্রদেশে বন্য জন্তুর দৌরাত্ম্য নাই। মিসরের পশ্চিমে বৃহৎ মরুভূমি, পূর্ব্বে লোহিতসাগর, উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার অসভ্য জনপদসকল। সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় মিসরবাসীদিগের অধিক ছিল না। এক্ষণে বিবেচনা কর, এই সকল কারণে প্রাচীনকালে দেশের কিরূপ

অবস্থা হইবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ বর্ষান্তে কৃষিকার্য্য করিবার যেরূপ সুবিধা থাকে, তাহাতে সাধারণতঃ লোকে কৃষিজীবী হইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ জল-প্লাবনে ক্ষেত্র সকল যেরূপ একাকার হইয়া যাইত, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভূমি নির্ণয় নিমিত্ত ভূমিপরিমাণ করিতে জানা আবশ্যক হইত। তৃতীয়তঃ কোন্ সময়ে নীলনদের জল বাড়িতে ও কোন্ সময়ে কমিতে আরম্ভ হয়, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সকলের আবির্ভাব, তিরোভাব বা অবস্থান নিরূপণ করিবার প্রয়োজন হইত। এই সকল কারণে অতি প্রাচীনকালে মিসরে কৃষিবিদ্যা, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চারম্ভ হইয়াছিল এবং দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

আবার ভাবিয়া দেখ, সমুদায় দেশটী একই উপত্যকা; মধ্যে কোন মরুভূমি, পর্ব্বত বা নদী থাকিয়া দেশটীকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নাই; সর্ব্বত্র গমনাগমনেরও সুবিধা ছিল। সুতরাং সমুদায় দেশটী একই রাজ্য হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহাই ঘটিয়াছিল। পলল পড়িয়া ভূমি যে প্রকার উর্ব্বরা হইয়াছিল, তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হইত। এ কারণে অনেক লোকে আহারান্বেষণ কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার অবসর পাইয়াছিল। ইহা হইতেই মিসরের পুরাতন সভ্যতার উৎপত্তি; ইহা হইতেই খ্রীষ্ট জন্মের তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের মহিমা প্রকাশ। আর দেশের চতুর্দ্দিক্ যে ভাবে রক্ষিত ছিল, তাহাতে বহুকাল পর্য্যন্ত বহিঃশত্রুর আক্রমণদ্বারা আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে নাই; বিশেষতঃ উপত্যকার সমুদায় অধিবাসিগণ একই রাজার অধীন থাকাতে সহসা মিসর আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। একস্থল হইতে অন্যস্থলে সর্ব্বদা যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে সর্ব্বত্রই লোকের শিক্ষা প্রায় একরূপই ছিল। ইহা দেখিয়া প্রাচীন গ্রীকেরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। গ্রীসে আথেন্স, স্পার্টা, আর্কেডিয়া, বিওসিয়া, থেশালী, ইপাইরস্ প্রভৃতি স্থান সকলের সভ্যতার তারতম্য ছিল; কিন্তু এ সকল স্থান পরস্পর যত দূরবর্ত্তী তদপেক্ষা অধিকতর দূরবর্ত্তী প্রদেশের মিসরবাসীদিগের মধ্যে সভ্যতাসম্বন্ধে কোন বিভেদ দৃষ্ট হইত না। নীল নদের উপত্যকা যেরূপ শস্যশালিনী ছিল, তাহাতে প্রয়োজনীয় বস্তু জন্য মিসরবাসীদিগের অন্যদেশের অপেক্ষা

রাখিতে হইত না। এজন্য তাহারা বহির্বাণিজ্য করিতে বা বিদেশে যাইতে ভাল বাসিত না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা উদ্ভিদভোজী হয়। মিসর এ বিষয়ের একটি প্রমাণ। কিন্তু মিসরের ন্যায় যেখানে অল্প পরিশ্রমে অনেক শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে আর একটি ফল ফলে। একে ত গ্রীষ্ম বলিয়া বস্ত্রের জন্য লোকের বিশেষ ভাবনা করিতে হয় না, তাহাতে আবার খাদ্য অনায়াসে লভ্য হইলে শ্রমজীবী লোকে বিবাহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে চিন্তিত হয় না। এইরূপে শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রমজীবীদিগের সংখ্যা বাড়িলে তাহাদিগের বেতনের হার কমে; সুতরাং তাহারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিতে পারে না, কোনরূপে মাত্র জীবন ধারণ করিতে পারে। এদিকে বহুসংখ্যক লোকের শ্রম আয়ত্ত করিতে পারিয়া ধনীদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। এইরূপে একদিকে যেমন শ্রমজীবীরা নিঃস্ব হইতে থাকে, তেমনই অপরদিকে কতকগুলি লোকের অধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে থাকে। অর্থবলে শেষোক্ত দলের অত্যন্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়; দেশের শাসনভার তাহাদিগের হাতে যাইয়া পড়ে; এবং তাহারা সমাজের মধ্যে উচ্চশ্রেণী বা প্রধান বর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। সভ্যতার ইতিহাসলেখক বাকলি সাহেব বিবেচনা করেন যে, এইরূপেই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং মিসরের যাজক ও সৈনিকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি। যেখানে সাধারণ লোকে এ প্রকার নিঃস্ব ও ক্ষমতাহীন, সেখানে শূদ্রদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার হইবে, এবং রাজা স্বেচ্ছাচারী বা উচ্চশ্রেণীর অনুগত হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষে ও মিসরে রাজা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন, কেবল তাঁহার ব্রাহ্মণ বা যাজকদিগকে কিয়ৎপরিমাণে ভয় করিতে হইত

নীলনদের উপত্যকা যেরূপ উর্ব্বরা, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রায় সেইরূপ। মিসরের ন্যায় এখানেও বৃষ্টি অল্প হয়, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে আর্ম্মাণদেশের পর্ব্বতে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহাতে নদীদ্বয় পুরিয়া যায় ও জলপ্লাবন উপস্থিত হয়। ইহাই তাহাদিগের তীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতার কারণ। সামান্য শ্রমেই সেখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই নিমিত্তই অতি প্রাচীনকালে তত্রত্য ব্যাবিলন রাজ্য

সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। নদীদ্বয় রাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পরিখা স্বরূপ ছিল; দক্ষিণে অনতিদূরেই সমুদ্র; উত্তরে পার্ব্বত্য আর্ম্মাণদেশ। সুতরাং দেশ রক্ষা কার্য্যও সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত। ব্যাবিলনের সভ্যতার পরিচয় দিতে বর্ত্তমানকালে পীরামিড প্রভৃতির ন্যায় প্রকাণ্ড কোন মন্দির নাই; কিন্তু এক সময় সেখানে চারিশত হস্তাধিক উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ব্যাবিলনে প্রস্তর পাওয়া যাইত না, সুতরাং ইষ্টক নির্ম্মিত সৌধসকল বিলুপ্ত হইয়াছে। নীলনদের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে যথেষ্ট প্রস্তর পাওয়া যাইত, সুতরাং তন্নির্ম্মিত মিসরের কীর্ত্তি এতকাল স্থায়ী রহিয়াছে। এক্ষণে মৃত্তিকাখনন করিয়া ব্যাবিলন রাজ্যের যে সকল স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কার্য্যের উদ্ধার হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার উত্তরে মিসর ভিন্ন আর কোন স্থানে অধিক পরিমিত অবিচ্ছিন্ন উর্ব্বরা ভূমি নাই; এবং অতি প্রাচীনকালে মিসর ভিন্ন আর কোথাও স্বতঃ সভ্যতার উৎপত্তি হয় নাই। এসিয়াখণ্ডে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে সিন্ধু ও গঙ্গার তীরে তাতারে চক্ষুস নদকূলে, এবং চীনে ইয়াংসিকিয়াং ও হোয়াংহো সন্নিহিত প্রদেশে, বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ভূমি ছিল। সুতরাং পুরাকালে চক্ষুস নদকূলে আর্য্য সভ্যতার উদয়; এবং ভারতবর্ষে ও চীনেও বিলক্ষণ সামাজিক ও মানসিক উন্নতি হইয়াছিল। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র ও একটি পর্ব্বতশ্রেণী, এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদ ও একটি শৈলমালা; এই সকল কারণে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়া সভ্যতা-বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল। আর এদেশে প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত এত অধিক জন্মিত যে, এখানকার অধিবাসীরা বিদেশের সহিত বিশেষ সংস্রব রাখিতে তত প্রয়াসী হন নাই। উত্তর দিক্ ব্যতিরিক্ত আর কোন দিক্ দিয়া চীন আক্রমণ করিবার সুবিধা ছিল না। সেই দিকেই চীনেরা বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুকাল পর্য্যন্ত চীনে ও ভারতবর্ষে রীতিনীতি অধিক পরিবর্ত্তিত হয় নাই দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা আবশ্যক যে কোন একটি অনুষ্ঠান বহুবিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপী হইলে বহু-কালস্থায়ী হয়; এবং চীন ও ভারতবর্ষ উভয়ই বৃহৎ দেশ, বিশেষতঃ উভয় দেশের অধিবাসীরাই স্বদেশে ভোগ্যবস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া

বিদেশের সহিত অধিক সংস্রব রাখেন নাই; সুতরাং অপর দিক হইতে কোন পরিবর্ত্তন স্রোত আসিয়া তাঁহাদিগকে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ফিনিসিয়া দেশ অবস্থিত। উহার বিস্তৃতি ও দৈর্ঘ্য উভয়ই অল্প। এক পার্শ্বে উচ্চ লিবেনন পর্ব্বত, অপর পার্শ্বে সমুদ্র। সমুদ্রে অনেক মৎস্য পাওয়া যায়, লিবেনন পর্ব্বতে বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। সুতরাং মৎস্য ধরিবার জন্য নৌকা নির্ম্মাণ করিতে অধিবাসীদিগের সহজেই প্রবৃত্তি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। নৌকায় ভ্রমণ করিতে করিতে বাত্যাবশে সাইপ্রসদ্বীপ ও নীলনদের মুখ পর্য্যন্ত তাহারা কখন কখন উপস্থিত হইবে বিচিত্র নহে। এইরূপে ক্রমে সমুদ্রপথে যাতায়াত করিতে তাহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইবে, এবং তাহারা সাইপ্রসদ্বীপ হইতে তাম্র ও মিশর হইতে শস্যাদির বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। লিবেনন পর্ব্বতেও অনেক বহুমূল্য ধাতু পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাদিগের বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবার সুবিধা হইয়াছিল, বোধ হয়। ব্যাবিলন ও মিসর প্রাচীন কালে যেরূপ সভ্য হইয়াছিল, একরাজ্যের উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত অপর রাজ্যে লইয়া গেলে বিলক্ষণ ব্যবসায় চলিবার কথা। অবস্থানগুণে ফিনিসিয়ার অধিবাসীরা এই ব্যবসায়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিল। ক্রমে ফিনিসিয়ার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয়। কোন কোন স্থানে কোন ধাতু বা বণিজ্ দ্রব্যবিশেষ সংগ্রহ নিমিত্তও তাহাদিগের তথায় থাকিবার প্রয়োজন হয়। ক্রমশঃ তাহারা সাইপ্রস, ক্রিট, গ্রীস, আফ্রিকা ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সন্নিবেশিত করে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের হিসাব রাখিবার কোনরূপ সহজ চিহ্ন ব্যবহার করা তাহাদিগের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে। মিসরে চিত্রসদৃশ (১৩) এক প্রকার অক্ষর প্রচলিত ছিল, ব্যাবিলনে শরমুখসদৃশ (১৪) আর এক প্রকার বর্ণমালা ছিল। ফিনি-সিয়াবাসীরা সংক্ষেপে হিসাব রাখিবার নিমিত্ত আরও সরল বর্ণমালা সৃষ্টি করিলেন। গ্রীক্ ও য়ীহুদীরা ফিনিসিয়া হইতেই অক্ষর প্রাপ্ত হন, এবং বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যজাতি ও তাহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ ও মুসলমান

(১৩) Hieroglyphics.

(১৪) Cuniform writings.

ও য়ীহুদীরা অদ্যাপি পরিবর্ত্তিত ফিনিসিয়ার বর্ণমালাই ব্যবহার করিতেছেন। ফিনিসিয়াবাসীরা যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তন্মধ্যে কার্থেজই উত্তর কালে বিশেষ বিখ্যাত হয়।

এসিয়াখণ্ড হইতে এক্ষণে ইউরোপের অভিমুখে চল। ইউরোপীয় সভ্যতার মূল গ্রীসদেশ। গ্রীস হইতে ইউরোপের অন্যান্য জাতি দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাকাব্যে হোমর তাঁহাদিগের আদর্শ, গীতিকাব্যে পিণ্ডার, নাটকে সফক্লিস ও ইস্কিলস। হেরোডোটস ইতিহাস রচনার পথদর্শক। সক্রেটিস ও প্লেটো দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষক। আরিষ্টটল বৈজ্ঞানিক প্রণালী সংস্থাপক। ইউক্লিড জ্যামিতির, আর্কিমিডিস পদার্থবিদ্যার, হিপার্কস ও টলেমি জ্যোতিষের, এবং হিপাক্রেটিস ভৈষজবিদ্যার দীক্ষাগুরু। ফিডিয়াস স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ, এবং এপিলিস চিত্রকর দলের উন্নতি পথ প্রদর্শক। এক্ষণে দেখা যাউক বাহ্যজগতের প্রভাবে গ্রীসে কিরূপ ফল ফলিয়াছে।

গ্রীসের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি কর। দেখিবে গ্রীস ও এসিয়া মাইনরের মধ্যবর্ত্তী সাগরের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলি পরস্পর এত নিকটবর্ত্তী যে সমুদ্রপথে একটী দেখিতে দেখিতে প্রায় আর একটিতে উপস্থিত হওয়া যায়। গ্রীসের নিকট হইতে দ্বীপাবলীর আরম্ভ; এবং সাগর মধ্যে যেখানে চাহিবে, সেখান হইতে কোন শৈল বা দ্বীপ দেখিতে পাইবে; এবং এক বন্দর হইতে অল্পদূরে অন্য বন্দর লক্ষিত হইবে। এরূপ অবস্থায় গ্রীসের অধিবাসীরা যে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া বাণিজ্য অবলম্বন করিতে ভালবাসিবে, এবং বাসযোগ্য দ্বীপগুলি ও এসিয়া মাইনর তাহাদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। এস্থলে অর্ণবযানে পর্য্যটন করিবার আর একটি সুবিধা ছিল। হেলেস্পণ্ট হইতে ক্রিট দ্বীপ পর্য্যন্ত নিয়মিত বাণিজ্যবায়ু বহিত।

গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। তাহাদিগের দ্বারা অল্পস্থল মধ্যেই অনেকপ্রকার জলবায়ুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। আথেন্সে অনেক যত্ন না করিলে দক্ষিণ প্রদেশের সুখাদ্য ফলসকল জন্মে না। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ দিকে চল। আগোলিসের উপকূলে কমলা ও কলম্ব লেবুর বিচিত্র উদ্যান দৃষ্ট হইবে। সে

স্থল হইতে কয়েক ঘণ্টা মধ্যে এমন স্থলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, যেখানে দ্রাক্ষালতাও বাঁচে না। এদিকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেসিনি প্রদেশে খর্জ্জুর পর্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিকটে নিকটে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হওয়ায়, পরস্পর বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা প্রবল হইবার কথা। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মধ্যে থাকায়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে স্থলপথে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, কুত্র বা অসম্ভব। আটিকা ও বিওসিয়ার মধ্যে পর্ব্বত, এবং এতদুভয় থেসালী হইতে চারি পাঁচ হাজার হাত উচ্চ শৈল-মালা দ্বারা বিভক্ত, উক্ত শৈলমালামধ্যে বিখ্যাত গিরিসংকট থর্ম্মাপলী। করিন্থ যোজক দিয়া দক্ষিণস্থ উপদ্বীপ যাইতেও পাহাড় বাধে; এবং উক্ত উপদ্বীপের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থলপথে যাওয়া অপেক্ষা জলপথে গমন অনেক সহজ। গ্রীসদেশের অঙ্গে সমুদ্র সর্ব্বত্র এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, সকল স্থান হইতে উহা নিকটবর্ত্তী। এই প্রকার নানা কারণে সাগর-পর্য্যটন-প্রবৃত্তি গ্রীকদিগের মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ঈদৃশ অনুমান করা অন্যায় নহে। উত্তরকালে গ্রীকদিগের যেরূপ বাণিজ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরের চতুঃপার্শ্বে যাদৃশ উপনিবেশাবলী সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগের দেশের অবস্থা হইতেই এইরূপে তাহার সূত্রপাত হয়।

গ্রীসের পূর্ব্বপার্শ্বে যেরূপ বন্দর ছিল ও যেরূপ গমনাগমনের ও বাণিজ্য করিবার সুবিধা ছিল, পশ্চিমপার্শ্বে সেরূপ ছিল না। পশ্চিম পার্শ্বের উপকূল দুরারোহ ও তথাকার বায়ু অসুখকর। সুতরাং পশ্চিম পার্শ্ব রোম ও আথেন্স উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেও তাহা পূর্ব্বপার্শ্বের ন্যায় সভ্য হইতে পারে নাই। আথেন্স যে আটিকা প্রদেশের রাজধানী, সে আটিকায় আবশ্যক শস্য জন্মিত না; সুতরাং আথেন্সবাসীরা খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। যে সকল স্থান স্পার্টার অধীন ছিল, সেখানে পর্য্যাপ্ত পরি-মাণে শস্য উৎপন্ন হইত। এই কারণেই বোধ হয় আথেন্সবাসীরা জলপথে যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ পারেন নাই।

গ্রীসের কোথাও সমতল ক্ষেত্র, কোথাও বা উচ্চ শৈল; কোথাও নদী প্রবাহিত, কোথাও জল পাওয়া দুষ্কর। আটিকা প্রদেশে উত্তম উত্তম বন্দর, পরিষ্কার বায়ু কিন্তু শস্যের অভাব। বিওসিয়া প্রদেশে যথেষ্ট উর্ব্বরাভূমি, যথেষ্ট শস্য; কিন্তু মৃত্তিকা সলিলসিক্ত ও বায়ু কুজ্ঝটিকাবিশিষ্ট। আরও

পশ্চিমে চল। দেখিবে দেশ শৈলময়, অধিবাসীরা ছাগ মেষ চরায় ও পর্ব্বতগহ্বরে বাস করে। দক্ষিণের উপদ্বীপে ও বিভিন্ন প্রদেশে এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হইবে। এইপ্রকার প্রদেশভেদে অবস্থাভেদ ঘটায়, গ্রীসে অল্পস্থানে অধিক মনুষ্যচরিত্রের ভেদ ঘটিবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম, ভাষা, ও রীতিনীতির বহুপরিমাণ একতাসত্বেও গ্রীকচরিত্রে যে বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, এইরূপ দৈশিক বৈচিত্র্যই বোধ হয় তাহার একটী প্রধান কারণ।

পর্ব্বত দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বলিয়া গ্রীসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্বতন্ত্র রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ইতিহাস লেখকেরা ইহার কয়েকটী ফল বর্ণনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ গ্রীস কখনই এক সাম্রাজ্য হইতে পারিল না, এবং এ নিমিত্ত অগ্রে মাসিডনের ও পরে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাজ্য ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্পদিনেই রাজারা সমুদায় প্রজামণ্ডলীর পরিচিত হইয়া পড়েন, এবং ইহাতে রাজাদিগের দেবত্বে বা অসাধারণ শক্তিতে লোকের বিশ্বাস তিরোহিত হয়। সুতরাং ক্রমে সর্ব্বত্র রাজপদ উঠিয়া যায়, এবং প্রদেশের অবস্থাভেদে সম্ভ্রান্ততন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ দেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হওয়ায়, স্থানভেদে ভাষাভেদ সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে আথেন্সে এক প্রকার ভাষা, স্পার্টায় আর এক প্রকার, থিব্‌সে অপর আর এক প্রকার। আবার যে প্রদেশের ভাষায় যে বিষয় প্রথমে আলোচিত হইয়াছিল, ভিন্ন স্থানের লোকে লিখিলেও সেই প্রদেশের ভাষায় সেই বিষয়ের আলোচনা করাই রীতি ছিল। এইরূপে মহাকাব্য সকল দুর্ব্বোধ্য হইলেও হোমরের ভাষায় রচিত হইত। আথেন্সে যে সকল নাটক লিখিত বা অভিনীত হইত, তাহাদিগের অন্তর্গত গীতগুলি আথেন্সের পরমশত্রু স্পার্টার ভাষায় গ্রথিত হইত। এমন কি যখন স্পার্টাবাসীরা আটিকা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, তখনও এ রীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই। আমাদিগের দেশের কবিরা যখন কৃষ্ণবিষয়ক গীতরচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতির ভাষার অনুকরণ করেন, তখন তাঁহারা গ্রীকদিগের পথাবলম্বী হন।

যে সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রধাবিত তাহারা যেরূপ অবস্থাভেদ উৎপন্ন করে, উত্তর দক্ষিণে ধাবিত পর্ব্বতগুলি সেরূপ করে না। হিমাচল তিব্বত হইতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতেছে। হিন্দুকুশ আফগান স্থান

হইতে তুর্কিস্থান পৃথক্ করিতেছে। আল্পস্ পর্ব্বত ইতালীকে ইউরোপের অপরভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতেছে। পীরেনিস্ ফ্রান্স ও স্পেন দেশ বিভিন্ন রাখিতেছে। ইউরাল পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বে রুশিয়া। আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেই একই ইতালী রাজ্য। রকি ও আণ্ডিস পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় দেশভেদের হেতু হয় নাই। এইরূপ হইবার একটী কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্ব্ব পশ্চিম প্রধাবিত পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা যে প্রকার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী দেশের শীতাতপভেদ ঘটে, উত্তর দক্ষিণ প্রধাবিত পর্ব্বত-শ্রেণী দ্বারা সে প্রকার হয় না। যখন সমতল প্রদেশস্থ অধিবাসীরা বিলাস-প্রিয় হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত শীতল পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের নিম্নদেশ আক্রমণ দ্বারা জয়লাভ করিবার কথা কোন কোন স্থানে শুনা যায়। কিন্তু আবার যখন কোন দেশে বিজেতৃদল প্রবেশ করে, তখন পরাজিত ব্যক্তিবর্গ পর্ব্বত প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর্য্যদিগের আক্রমণে এদেশে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতির এইরূপ দশা হইয়াছে।

জঙ্গলে সভ্যতা বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা করে। অরণ্য কাটিয়া কৃষি-কার্য্যের অধিকার বৃদ্ধি, সভ্যতা বিস্তৃতির একটি প্রধান লক্ষণ। ইউরোপ-খণ্ডে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে বন ছিল। কিন্তু বহুকাল হইল নৈসর্গিক কারণে বা মনুষ্যের প্রভাবে দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশের কানন সকল বিনষ্ট হয়; এবং সেই প্রদেশেই অগ্রে সভ্যতার উদয় হয়। গ্রীস, ইতালী, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইহার দৃষ্টান্তস্থল। জঙ্গলের অধিবাসীরা প্রায়ই অসভ্য, এই কারণে জঙ্গলিয়া বলিতে অসভ্য বুঝায়। যখন কোন দেশ বিজিত ও উপনিবেশিত হয়, তখন পরাভূত জাতি অনেক স্থলে নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া আপনাদিগের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করে। এই নিমিত্ত কানন প্রদেশ অনেক সময় অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বাসস্থল হয়। আমেরিকা ও সাইবিরিয়ায় দেখা যায় যে, যাহারা জঙ্গলে বসতি করে, তাহাদিগের প্রকৃতি কিয়ৎ পরিমাণে জঙ্গলিয়া হইয়া যায়। কোন কোন বুদ্ধিমান্ লোকে বিবেচনা করেন যে, জর্ম্মণদিগের বহুবিবাহ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের নিকট হইতে অনুকৃত।

যাহারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জঙ্গলে বাস করে, তাহারা দুর্ব্বল, ক্ষুদ্রকায়, কদাকার ও নির্ব্বোধ হয়। হিমালয়ের দক্ষিণস্থ শাসলনের মেচিরা সিংহলের বৃহদরণ্যের বেদেগণ, মাডাগাস্কার দ্বীপের জোলাহিরা, ফ্লোরিডা

উপদ্বীপের নিবিড় কাননের আমেরিকেরা ইহার প্রমাণ। যে স্থানে বহুদূর-ব্যাপী কানন থাকে, সে স্থানের ভূমি এত সলিলসিক্ত হয়, যে তাহা মনুষ্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়। ইহাই বোধ হয় জঙ্গলবাসীদিগের অবনতির কারণ।

বাহ্যজগতের অবস্থাভেদে মানবেতিহাসে কিরূপ ফলভেদ ঘটিয়াছে, আমরা দেখাইলাম। কিন্তু কেহই যেন মনে করেন না যে, কেবল দৈশিক সংস্থান দ্বারা, কেবল চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহিঃপদার্থ দ্বারা ইতিহাসের ঘটনামালার ব্যাখ্যা করা যায়। প্রত্যেক জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিও এস্থলে গণনীয়। নীলনদের তীরে কাফ্রিরা থাকিলে যে তাহারা প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হইতে পারিত, কে সাহস করিয়া বলিবে? আর্য্যেরা যদি ভারতবর্ষে না আসিতেন, তাহা হইলে কি এদেশে বাল্মীকি বা কালিদাসের ন্যায় কবি, গৌতম বা কপিলের ন্যায় দার্শনিক, এবং আর্য্যভট্ট বা ভাস্করাচার্য্যের ন্যায় গণিতবেত্তা জন্মিত? যদি বাহ্যবস্তু হইতেই সমুদয় হয়, তাহা হইলে মিসর, ব্যাবিলনিয়া ও গ্রীসের সভ্যতা অন্তর্হিত হইল কেন? দেশের ভাব প্রায় একরূপই আছে, কিন্তু অধিবাসীদিগের ভাব অন্য প্রকার হইয়াছে কেন? আর্য্যজাতি ইউরোপখণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তথায় অন্য জাতীয় লোক বাস করিত; কিন্তু তাহাদিগের সভ্যতার চিহ্ন ভগ্নপ্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র। য়িহুদীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহাদিগকে চিনা যায়। গ্রীনলণ্ডে যাও, আমেরিকায় যাও, আফ্রিকায় যাও, অষ্ট্রেলিয়ায় যাও; ইংরেজ সর্ব্বত্রই সমান দেখিবে। চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিসরের অট্টালিকায় যে কাফ্রি চিত্রিত আছে, এখনও তাহার মূর্ত্তি বা অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আবার দেখ, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যে আর্য্যজাতি যে প্রকার উন্নতি দেখাইয়াছেন, অন্য কোন জাতি সেরূপ পারে নাই; এবং সৈমজাতি হইতেই য়িহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান তিনটী একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ক্ষমতা; এবং যে কোন অবস্থায় যে জাতিকে রাখ না কেন, সহসা তাহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না।

কিরূপে নিগ্রো, মোগল, মালয়, আর্য্য, সৈম প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকৃতি-বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হইল, স্থির করিয়া বলা যায় না। পরিণামবাদী ওয়ালেস্ সাহেব বিবেচনা করেন যে আদৌ বাহ্যাবস্থার ভেদই এরূপ

জাতিভেদ উৎপন্ন হইবার কারণ। যখন মনুষ্যেরা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, যখন তাহাদিগের কোনরূপ পরিধেয় ছিল না, যখন তাহারা অগ্নিকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা পাক করিতে বা নিয়মিত শারীরিক তাপ রক্ষা করিতে জানিত না, তথন তাহারা যে দেশে যাইত অন্য জীবের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সে দেশের স্বভাবানুবর্ত্তী হইত। সে দেশে শীত থাকিলে, সম্পূর্ণরূপে শীত সহ্য করিত। সে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান হইলে, আতপতাপে পুড়িত। সেখানে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিলিত, তাহাই আহার করিত। এইরূপে তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাসস্থলের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু প্রাচীন কালে যাহা হইয়া থাকুক, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বাহ্য জগতের ক্ষমতা কমিয়া যাইতেছে এবং মনুষ্যের প্রভাব বাড়িতেছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানকালে দেশের অবস্থা অপেক্ষা অধিবাসী-দিগের জ্ঞানবৃদ্ধির উপর সভ্যতাবৃদ্ধির নির্ভর করিতেছে। যে জাতি যে পরিমাণে নৈসর্গিক নিয়ম অবগত হইতেছে ও তদনুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নত হইতেছে। কালে বোধ হয় মনুষ্যের প্রভুত্ব এত বহুবিস্তীর্ণ হইবে যে, ভূমণ্ডলে মানবের অপ্রয়োজনীয় জীবোদ্ভিদ কিছুই থাকিবে না, এবং প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এত দূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে যে, তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

জ্ঞান ও নীতি। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকে বলেন যে, মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই। † বিজ্ঞান দিন দিন কত নূতন তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু নীতিশাস্ত্র কোন নূতন কথা কহিতে পারে না। দূরবীক্ষণ সহযোগে গগনচর অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আকৃতি প্রকৃতি নির্ণীত হইতেছে; অণুবীক্ষণ সহকারে জলবিন্দুস্থিত কোটি কোটি কীটাণুগণের জীবনযাত্রা

* বঙ্গদর্শন, আষাঢ়, ১২৭৯।

† সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিৎ বাকল্ "সভ্যতার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন

পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে; উচ্চ হইতে উচ্চতর নৈসর্গিক নিয়ম নিরূপণ দ্বারা সমুদায় বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধ ঘটনামালা বলিয়া প্রতীত হইতেছে; আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্বে বিজ্ঞানের যেরূপ অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহা হইতে কত বিভিন্ন হইয়াছে। গতি, আলোক, তড়িৎ, তাপ, শব্দ প্রভৃতি পদার্থ নবীন ভাব ধারণ করিয়াছে; জ্যোতিষ, রসায়ন, শরীরতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বে কত অভিনব সত্য উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অসভ্য য়িহুদী ব্যবস্থাপক মুসা যে সকল নীতি বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন, সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসীরা তাহা অপেক্ষা কি অধিক দিতে পারেন? আর যে ভারতবর্ষকে উপধর্ম্মসঙ্কুল বলিয়া তাঁহারা ঘৃণা করেন, সে ভারতবাসী মনু ও বুদ্ধ প্রাচীনকালে যেরূপ সুনীতির নিয়ম সংস্থাপন করিতে যত্ন পাইয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহারা কি জানেন? যদি মত পরিত্যাগ করিয়া চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কি ইদানীন্তন কালীন সভ্যজাতিদিগকে অন্যাপেক্ষা সচ্চরিত্র বোধ হয়? যাঁহারা ইউরোপ ও আমেরিকার মদ্যপায়িতা, অর্থলোভ, ইন্দ্রিয়সুখাসক্তি ও স্বার্থপরতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই একথা স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা বর্ত্তমান কালস্থ সভ্যনামগর্ব্বিত সমাজসমূহে ভীষণমূর্ত্তি দরিদ্রতার প্রবলতা ও দীনাহীনা নিরুপায়া অবলাকুলের দুরবস্থা দেখাইয়া উন্নতপদবীবিশিষ্ট শুভ্রকান্তি মহাত্মাগণের নৈতিক অনুন্নতি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা বলেন, যেখানে একদিকে কতকগুলি লোকে অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে জগতীতলস্থ সমস্ত উপাদেয় পদার্থে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, আর অন্যদিকে "হা অন্ন, হা বস্ত্র", করিয়া অসংখ্য বুদ্ধিজীবী জীব কষ্টশ্রষ্টে কথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করত অকালে কালের করাল কবলে কবলিত হইতেছে, সেখানে কখনই সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান অন্যদেশীয়দিগের অপেক্ষা অধিক নাই।

মনুষ্যের নীতি বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে কি না এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ নৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, আমরা এই প্রস্তাবে মীমাংসা করিতে যত্ন করিব, কতদূর কৃতকার্য্য হইব, সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

মনুষ্যের আদিম কালের অবস্থা আমরা কিছুই জানি না। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন অন্যূন লক্ষবর্ষ নরজাতি অবনীমণ্ডলে প্রাদু-

ভূত হইয়াছে; কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সময়ের মধ্যে আমরা কেবল কোন কোন দেশের শেষ তিন চারি হাজার বৎসরের ইতিহাসের কিয়দংশ মাত্র অবগত আছি। যদি এই অল্প কালের মধ্যে বিশেষ নৈতিক উন্নতি প্রত্যক্ষীভূত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে নীতিবিষয়ে লক্ষ বৎসরে কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, এ প্রকার উক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না; কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন, প্রায় সকল দেশেই জনপ্রবাদ আছে যে পূর্ব্ব-কালে লোকে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক ছিল, আমাদিগের দেশীয় সত্যযুগ এবং যবন ও রোমক জাতির স্বর্ণযুগ প্রাচীনদিগের নীতিশ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকেও বলে প্রথমে মনুষ্য নিষ্পাপ ছিল, পরে সয়তানের কুহকে পড়িয়া পাতকপঙ্কে পতিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির পুরাতন গ্রন্থ পাঠে প্রতীতি হইতে পারে যে, কালসহকারে নরজাতির নৈতিক অবনতি হইতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের উত্তর এই যে স্বভাবতঃ পিতামাতা এবং বৃদ্ধগণের প্রতি মানবগণের যথেষ্ট ভক্তি আছে, আপনাদিগেব সমবয়স্ক চপলস্বভাব যৌবনোন্মত্ত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা তাহাদিগকে সচ্চরিত্র দেখিয়া প্রাচীনদিগকে অপেক্ষাকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া অনেকের ভ্রম জন্মিতে পারে; বিশেষতঃ সমকালীন লোকদিগকে যেমন পাপে লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, অতীত কালের বিষয়ে জ্ঞান না থাকাতে পূর্ব্বকালস্থ লোকেরা সেরূপ পাপে লিপ্ত ছিল, পুরাবৃত্তানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবিতে পারে না। আমরা বর্ত্তমান কাল ও সমীপস্থ পদার্থের প্রতি অসন্তুষ্ট, কারণ তাহাদিগের দোষ পদে পদে লক্ষিত হয়; কিন্তু দূরস্থও অজ্ঞাত বস্তুচয় আমাদিগের নিকট রমণীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। এজন্যই আমরা পদতলস্থ শ্যামল শস্য ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অস্পষ্ট বিজন বন্ধুর তুঙ্গগিরিশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করি। এজন্যই আমরা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত বর্ত্ত-মান জীবনপ্রবাহ পরিহারার্থ স্মৃতিপথে বাল্যকালাভিমুখে গমন করি, এবং আশার সাহায্যে অজ্ঞেয় ভবিতব্যবর্ত্মে ধাবিত হই। এজন্যই লোকে অন্ধতমসাবৃত অলক্ষ্য অতীত প্রদেশে সত্য বা স্বর্ণযুগ বিরাজমান দেখে। এজন্যই দুঃখময় কলির অবসানে ভারতবাসিগণ পুনরায় সত্য-যুগের আবির্ভাব এবং য়িহুদী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ীরা "মিলিনিয়ম" কল্পনা করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকালে মনুষ্যের যে অতীব হীনাবস্থা ছিল, যাঁহারা "ডার-

উইন্ ওয়ালেস্ সাহেবের মতাবলম্বী তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।* যদি নর ও বানর উভয় জাতিই একবংশজাত হয়, তাহা হইলে মানবকুলের যে নীতিবিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিজ্ঞানবেত্তৃদ্বয়ের দিগন্তপ্রসারী মত সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পুরাতন জনশ্রুতি, অসভ্যজাতি-দিগের বর্ত্তমানাবস্থা, এবং বিগত ত্রিসহস্র বর্ষের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে সভ্যজাতিগণ যে অপেক্ষাকৃত সুনীতিসম্পন্ন হইয়াছে, স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।

রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে নরবলি প্রচলিত ছিল। † পরে যখন বিবেচনা হইল যে "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম," তখন কি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নীতিবিষয়ে উন্নতির পথে একপাদ

---

* ডারউইন্ ও ওয়ালেস্ উভয়েই পরিণামবাদী। ইঁহাদিগের মতে অবস্থাভেদে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প পরিবর্ত্তন ঘটিয়া কালসহকারে ইতর জন্তু হইতে উচ্চতর জীব সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

† বালকাণ্ড রামায়ণ, ৬১ ও ৬২ সর্গ শুনঃশেফের উপাখ্যান দেখ। কয়েকটি শ্লোক মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল।

এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্।
অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে॥
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রোজহার হ।
প্রণষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ॥
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রণষ্টস্তব দুর্ণয়াৎ।
অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর॥
প্রায়শ্চিত্তং মহদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ।
আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে॥

এই কালে অম্বরীষ নামে খ্যাত মহান্ অযোধ্যাপতি যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন। সেই যজমানের পশু ইন্দ্র হরণ করিলেন। সে পশু অপহৃত হইলে বিপ্র রাজাকে বলিলেন "রাজন্ তোমার দুর্নীতি নিমিত্ত সংগৃহীত পশু অপহৃত হইয়াছে। হে নরেশ্বর, রক্ষাকার্য্যে পরাঙ্মুখ রাজাকে দোষ সকল নষ্ট করে। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইতে, হে পুরুষর্ষভ, হয় সেই পশুকে নতুবা মহৎ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কোন নরকে শীঘ্র আনয়ন কর।

অগ্রসর হন নাই? মহাভারতে প্রকটিত আছে আদিমকালে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-সংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারিতা সৎকার্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইত; কোন স্বজাতীয় পুরুষে বাসনা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাই নারীগণের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। পরে যখন শ্বেতকেতুর ধর্ম্মবুদ্ধি প্রভাবে সতীত্বের সৃষ্টি হইল; তখন কি আর্য্যগণ নৈতিক উন্নতি সোপানে কিয়দ্দূর উর্দ্ধগামী হন নাই? *

---

* অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষ্বদ্যাপি পূজ্যতে॥
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অস্মিংস্তু লোকে নচিরান্মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে॥
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু।
বভূবোদ্দালক নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্॥
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ।
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা॥
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে।
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ॥
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ।
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ॥
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব।
ক্রুদ্ধং তন্তু পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ॥
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি॥
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ।
ঋষিপুত্রোঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে॥
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি।
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
তদা প্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্॥

শত্রুবিনাশের অনেক প্রশংসা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে দেখা যায়; কিন্তু "যেমন চন্দন বৃক্ষ ছেদনকালেও ছেদনকারীকে সুগন্ধ দান করে, তেমনি সাধু ব্যক্তি মরণকালেও প্রাণাপহারক অপকারকের উপকার করেন," এই মহাবাক্য যখন সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইল, তখন কি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্র সুনীতি-বৃদ্ধি হয় নাই?

ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
১২২ অধ্যায়। আদিপর্ব্ব। মহাভারত॥

হে সুমুখি চারুহাসিনি! পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধ, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম, ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন, উত্তর কুরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিত কহিতেছি শুন। শুনিয়াছি উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। সেই শ্বেত-কেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা শুন। একদা উদ্দালক শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন। এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন এবং এস যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষি-পুত্র এই রূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন স্বচ্ছন্দবিহার করে, মনুষ্যেরাও সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দবিহার করে, ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিলেন। হে মহাভাগে! আমরা শুনিয়াছি তদবধি এই নিয়ম মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে; কিন্তু অন্য অন্য জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক, তাহার ভ্রূণহত্যাসমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক অনূদিত।

প্রাচীনকালে যে সর্ব্বদেশে নরবলি প্রদত্ত হইত, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই। ফিনিসিয়া, কার্থেজ, গ্রীস, য়িহুদী ভূমি, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের বিষয়ে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি এতদ্দেশস্থ অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এ কুপ্রথা চলিত আছে। যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়, সেখানেও এই নৃশংস ব্যাপার প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। আমাদিগের অনুমান হয়, যাহারা নরবলি প্রদান করিত, তাহারা কোন না কোন সময়ে নরমাংসাশী ছিল; কারণ নরমাংস সুখাদ্য বলিয়া বোধ না হইলে কখনই দেবতাগণের সন্তোষসাধনার্থে তাহা দিতে প্রথমে প্রবৃত্তি হইত না। এখনও অনেক অসভ্য জনপদে নরমাংস ভক্ষণ চলিতেছে। এতদ্দেশীয় গ্রন্থনিচয়ে যে রাক্ষসদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা, বোধ হয়, এইরূপ মানবভোজী ছিল। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আদিকালে মনুষ্যগণ অন্য লোককে আপনার আয়ত্ত করিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া আহার করিত। এই রাক্ষসবংশে বর্ত্তমানকালস্থ সভ্যজাতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভাবিলেই তাঁহারা নীতি বিষয়ে কত উন্নত হইয়াছেন, কতদূর অনুভূত হইবে। ইঁহাদিগের যেরূপ দয়া-দাক্ষিণ্য, আচার ব্যবহার, তাহাতে ইঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিতে হয়।

অনেক অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কেহ সতীত্ব ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানে না। যদি বর্ত্তমানকালীয় সভ্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাদৃশ দশাপন্ন এককালে ছিলেন, এই মতটী প্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনেক নৈতিক উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মবলে কোন নারীর বিষয়ে মনে মনে অসহ ইচ্ছা করাও পাপ।

অসভ্য জাতিগণ অন্য জাতীয় লোকদিগকে শত্রুজ্ঞান করে এবং শত্রুবধ করাকে পুণ্য ভাবে। সভ্যজাতিগণের মধ্যে এই ভাব অনেকদূর তিরোহিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অন্ততঃ মুখেও বলিবেন, "সকল মনুষ্যই পরমেশ্বরের সন্তান, আমরা সকলেই এক পিতার পুত্র, আমরা সকলেই ভ্রাতা, পরস্পরের প্রতি প্রীতি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।" কার্য্যে যাহা হউক, এরূপ মিষ্ট কথা শুনিলেও কর্ণ জুড়ায়—এরূপ মতপ্রকাশ অনেক নীতিবিষয়ক উন্নতির নিদর্শন। যথার্থ পক্ষে ইহাও বলা উচিত, যে, ইউ-রোপ ও আমেরিকা খণ্ডে অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা পরোপকারব্রতে

নিয়ত ব্রতী রহিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ না দেখিয়া চির-জীবন মানববংশের মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন।

অসভ্যজাতিগণ যাহাদিগকে আহার না করে বা মারিয়া না ফেলে, তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি সভ্যজাতিও দাসত্ব অবৈধ জ্ঞান করেন নাই। আরিষ্টটল্ ও মনু দাসত্বকে নীচ জাতির স্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শূদ্র, গ্রীসের "হেলট," রোমের "গ্লাডিয়েটর", সমাজের দাস স্বরূপ ছিল; তাহারাই উচ্চশ্রেণীস্থ জনগণের সেবা শুশ্রূষা করিত। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেণ্ট্ পল নামক বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবেও দাসত্ব যে নীতিবিরুদ্ধ, ইহা বুঝিতে পারেন নাই; কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে অল্পদিন হইল এই নীতি বিষয়ক প্রত্যয়টী সভ্যজাতিদিগের মধ্যে জন্মিয়াছে যে, মনুষ্যকে দাস করিয়া রাখা অত্যন্ত অন্যায়; সকল লোকেই সমান, সকল লোকেরই স্বাধীন হওয়া উচিত। মানবগণের সমানতা ও স্বাধীনতা রূপ মহাবাক্য প্রথম ফরাসিস্ রাজবিপ্লবে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চারিত হয়। ইহা একটী নীতিশাস্ত্রের নূতন তত্ত্ব—বর্ত্তমান সভ্যজাতিদিগের প্রকাশিত। ইহা অত্যল্প কাল মধ্যে অনেকগুলি মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। ইহার প্রতাপে আফ্রিকার দাসবিক্রয় বন্ধ হইয়াছে, আমেরিকা ও রুসিয়ার বহুসংখ্যক লোকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং স্ত্রী জাতির নীচাবস্থা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে। পরিণামে যে ইহা দ্বারা মনুষ্যসমাজের অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইবে, যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন।

যাঁহারা উপরে উপরে দেখেন তাঁহারা নরজাতির নৈতিক উন্নতি দেখিতে পান না; তাঁহারা বলেন, প্রাচীনেরাও যে উপদেশ দিতেন, নব্যেরাও তাহাই দেন। মিথ্যা কথা কহিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না, পরদারা হরণ করিবে না, পরের অপকার করিবে না, এই কথাই চিরকাল শুনা যাইতেছে; কিন্তু যখন ঈশা বলিলেন যে মনের সহিত ঈশ্বরকে ও লোক সকলকে প্রীতি করাই সকল ধর্ম্মের সার, তখন কি জগতীতলে নূতন নীতিপুষ্প বিকসিত হইল না? যেমন জগদ্বিখ্যাত নিউটন্ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত জড়পিণ্ড সম্বদ্ধ, তদ্রূপ ঈশা প্রকাশ করিয়াছেন যে মনুষ্য-

সমাজ সুখময় করিতে হইলে প্রীতিবন্ধনে সকলের বদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রীতির অর্থ অদ্যাপি লোকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না। নবাবিষ্কৃত সমানতা ও স্বাধীনতা এই প্রীতির গাঢ় ভাব দিন দিন উজ্জ্বলতর করিবে; এবং সকলেই স্বাধীন, সকলেই সুখভোগে সমান অধিকারী, এই ভাবিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই যেমন প্রীতিপূর্ণচিত্তে সকলের প্রিয়কার্য্য করিতে সযত্ন হইবে, তখন অবনীমণ্ডল নূতন শোভা ধারণ করিবে।

পূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে।—

১। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে যে পরিমাণে নির্দ্দয় ও অশিষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সভ্যজাতিদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অনেক কম।

২। অনৈতিহাসিক সময়স্থ প্রাচীনদিগের যেরূপ নৃশংসতা ও স্বেচ্ছাচারিতার জনশ্রুতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, নব্য সভ্যজাতিদিগের সেরূপ অহিতাচার নাই।

৩। ঐতিহাসিক কালে প্রীতি, সমানতা, স্বাধীনতা প্রভৃতি কয়েকটী নূতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া দিন দিন মনুষ্য সমাজের সংস্কার করিতেছে।

অতএব বলা যাইতে পারে মানবকুলে জ্ঞানেরও যেমন উন্নতি আছে, নীতিরও তেমনি উন্নতি আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সকলেই স্বীকার করেন, সভ্যতাবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে যে সভ্যতার তারতম্যানুসারে নীতিরও তারতম্য লক্ষিত হয়। এরূপ হইবার কারণ কি, সভ্যতার প্রকৃতি বিবেচনা করিলেই সহজে বুঝা যায়। মনুষ্য যত পশু ভাব পরিত্যাগ করিতেছে, যত প্রকৃতির নিয়ম অবগত হইয়া বাহ্য জগতের উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতেছে, যত নিজের প্রবৃত্তি দমন করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে শিখিয়াছে ততই ক্রমে ক্রমে সভ্য হইতেছে। 'সভ্যতার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বাকল্ সাহেবও ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন। তিনি মানসিক উন্নতিকেই সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণ্য করেন

তাঁহার মতে "এই উন্নতি দুই প্রকার; নৈতিক ও বৌদ্ধিক; প্রথমটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিষয়ে, দ্বিতীয়টী জ্ঞান বিষয়ে।" (১) তিনি আরও বলেন, "যদি, এক পক্ষে কোন জাতির ক্ষমতা বৃদ্ধি সহকারে পাপবৃদ্ধি হইতে থাকে, অথবা অপর পক্ষে, যদি ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতা বাড়িতে থাকে, নিঃসন্দেহ সে জাতি উন্নত হইতেছে না। এই দুই প্রকার গতি, নৈতিক ও বৌদ্ধিক, সভ্যতারূপ ভাবের অঙ্গ স্বরূপ, এবং মানসিক উন্নতির সম্পূর্ণ মর্ম্ম নির্দ্দেশক।" (২)

কিন্তু বাক্‌ল্ যদিও নৈতিক উন্নতিকে সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহার মতে মনুষ্যের নীতি কিঞ্চিন্মাত্রও উন্নত হয় নাই; উহা চিরকালই স্থিরভাবাপন্ন আছে; পূর্ব্বকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে। লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুনীতিসম্পন্ন হইয়াছে কি না, বাক্‌ল্ বোধ করেন, ইহা নির্ণয় করিবার একটীমাত্র উপায় আছে। দেখ, নীতি বিষয়ে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। লোকের কার্য্য বিশ্বাসের অনুগত; যদি অভিনব নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা সেই বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকে, তবে নীতি সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বাক্‌ল্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নীতির উন্নতি নাই। তিনি বলেন, "আমাদিগের নৈতিক আচরণ সম্বন্ধে, সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের জ্ঞাত এমন একটী নিয়ম নাই যাহা প্রাচীনেরা জানিতেন না।" (৩) "পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জ্জন করিবে; প্রতিবেশিগণকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতামাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে; এই গুলি এবং আরো গোটাকতক নীতিশাস্ত্রের সার কথা। কিন্তু এগুলি কত সহস্র বৎসর পরিজ্ঞাত রহিয়াছে, এবং কি উপদেশ, কি বক্তৃতা, কি গ্রন্থ দ্বারা কোন নীতিবেত্তা ও ধর্ম্মোপদেষ্টা একটী বিন্দু বিসর্গও বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।" (৪)

---

(১) Buckle's History of Civilization, Vol. I. p. 174.

(২) Ibid. p. 177.

(৩) Ibid p. 181.

(৪) Ibid p. 180.

"যে বলে পূর্ব্বাজ্ঞাত কোন নীতিতত্ত্ব মানবজাতি খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয় ত মহামূর্খ, অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক বঞ্চনাকারী।" (৫)

আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতদূর আইসে, তাহাতে বোধ হয়, বাক্‌ল্ সাহেব মহাভ্রমে পতিত হইতেছেন। প্রথমতঃ আমরা স্বীকার করি না যে, যদি নীতি বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, নৈতিক উন্নতি হয় নাই। কোন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎকাল যোগ্য নীতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সমকালবর্ত্তী লোকদিগের অযোগ্যতা নিবন্ধন এই তত্ত্ব সমুদ্রতলস্থিত রত্নের ন্যায় অব্যবহৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে। তাহা পুনরুদ্ধৃত বা জনসমাজে পরিগৃহীত হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা; এবং পরিগৃহীত হইলেও তদ্দ্বারা লোকের কার্য্য নিয়মিত হইতে বহুকাল গত হইবে। কর্ত্তব্য জানিলেও অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন, "আমাদিগের উপদেশানুসারে চল, আমাদিগের আচরণের অনুকরণ করিও না।" তাঁহারা জানেন, তাঁহারা অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন না। এই রূপ বিবেক ও বাসনার সমর কত লোকের অন্তঃকরণে চলিতেছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রায় সহস্র বর্ষ ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত আছে; কিন্তু সেখানকার কত অংশ লোকে তাহার সার নীতিতত্ত্বগুলি জানে, এবং যাহারা জানে তন্মধ্যে কতকভাগ লোকে তদনুরূপ কার্য্য করে? ঈশার শিক্ষার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়া সম্যক্ প্রকারে তদনুসারে চলিলে ইউরোপীয়দিগের নূতন দেবতুল্য ভাব হইত। তাহা হইলে আর তাঁহারা পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে চেষ্টা পাইতেন না, অর্থ এবং ইন্দ্রিয়ের দাস থাকিতেন না। তাহা হইলে আর ভূমণ্ডলের সভ্যতম বিভাগে সমরানল প্রজ্বলিত হইত না, নরশোণিতপাত হইত না, দেশ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইত না। যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম বহুকাল পরিগৃহীত হইয়াও জ্ঞানব্যাপ্ত ইউরোপ মণ্ডলের কার্য্য নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে নিয়মিত করিতে পারিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন নীতিতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া কার্য্যকরী হইতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং যে সময়ে

(৫) Note to page 180, Vol. I. B. H. C.

কোন অভিনব নৈতিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে না, সে সময়ে পূর্ব্বাবিষ্কৃত তত্ত্ব-জনিত নৈতিক উন্নতি বহুল পরিমাণে আস্তে আস্তে হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, নীতিশাস্ত্র সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষা জটিল; সুতরাং অন্য শাস্ত্রে যে কাল মধ্যে যে পরিমাণে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা, নীতিশাস্ত্রে সে কাল মধ্যে সে পরিমাণে নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত না হইবার কথা। অগোস্ত্ কোম্ত্ দেখাইয়াছেন যে, বিজ্ঞানের বিষয় যত সরল, তাহার তত শীঘ্র উন্নতি হইয়া থাকে। নীতিবিজ্ঞান, মনুষ্য সমাজ ও মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া জটিলতম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে; কি প্রকারে ত্বরায় উন্নত হইবে? কিরূপ কার্য্য মনুষ্যের মঙ্গলকর, কিরূপ কার্য্য অমঙ্গলকর, বহুকাল পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে নির্ণীত হইবার নহে। অগোস্ত্ কোম্ত্ বিজ্ঞান শাখা নিচয়কে জটিলতার তারতম্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সরলতম গণিতকে সর্ব্বপ্রথমে স্থান দিয়াছেন, তৎপরে অপেক্ষাকৃত জটিলতর জ্যোতিষকে, তদনন্তর জটিলতা বৃদ্ধির ক্রমাবলম্বন পূর্ব্বক পদার্থবিদ্যা, রসায়নতত্ত্ব, জীবনতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বকে যথাক্রমে রাখিয়া সর্ব্বশেষে জটিলতাশ্রেষ্ঠ নীতি শাস্ত্রকে সংস্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা নীতিশাস্ত্রকে পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন তত্ত্বের ন্যায় উন্নতিশীল না দেখিয়া তাহার একেবারে উন্নতি নাই, স্থির করিয়া বসেন, তাঁহাদিগের নিতান্ত ভ্রম। জ্যোতিষের অনুন্নতি সন্দর্শনে প্রাচীন পণ্ডিতকুলচূড় সক্রেটিস্ও এক সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, গগনচর জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের বিষয়ে মানবজাতি কখনও কিছু স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি দ্বারা এক্ষণে সেই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, নীতিবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে যে মানবজাতি চিরকাল স্থির-ভাবাপন্ন রহিয়াছে, একথা অপ্রামাণ্য। যদি ইহা সত্য হইত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকলের ন্যায়ান্যায় বোধ একরূপই হইত। কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসপাঠ ও দেশভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন যে, দেশভেদে ও কালভেদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানের কত বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এক সময়ে বা একপ্রদেশে যাহা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে, অন্য সময়ে বা অপর প্রদেশে তাহা নিতান্ত জঘন্য ও নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে। স্পার্টাবাসীদিগের মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি এবং

আমাদিগের দেশে সহমরণ প্রশংসনীয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে কে এবংবিধ ব্যাপারের অনুমোদন করে? যদি পুরাবৃত্ত উদ্‌ঘাটন করিতে না চাও, বর্ত্তমান কালের অসভ্য জাতিগণের প্রতি দৃষ্টি কর; জানিতে পারিবে, তাহারা নীতিতত্ত্বসম্বন্ধে সভ্য জাতিগণাপেক্ষা কত অনভিজ্ঞ। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন, "অষ্ট্রেলীয় ভাষায় ন্যায়-পরতা, পাপ, দোষ বুঝায়, এমন কোন শব্দ নাই। অধিকাংশ নিকৃষ্ট জাতিদিগের মধ্যে পরোপকারিতা ও ক্ষমাশীলতাসূচক কার্য্যের অর্থবোধ হয় না, অর্থাৎ সমাজ সম্পর্কে মনুষ্যকার্য্যের জটিলতর সম্বন্ধসকল বোধ-গম্য হয় না।" (৬) গ্যালব্রেথ সাহেব আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অনেককাল বাস করিয়া তাহাদিগের নীতি বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন যে, "তাহারা অধিকাংশ পাপকর্ম্মকে পুণ্য জ্ঞান করে। চুরি, ঘরজ্বালানি, বলাৎকার এবং হত্যা, তাহাদিগের মধ্যে খ্যাত্যাপন্ন হইবার উপায় বলিয়া গণ্য হয়, এবং অল্পবয়স্ক আমেরিক বাল্যকাল হইতে হত্যাকে ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে শিক্ষিত হয়।" (৭) পলিনেসীয় পর্য্যালোচনায় উক্ত হই-য়াছে, "সন্তানগণের মধ্যে তিন ভাগের দুই ভাগ পিতামাতায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মারিয়া ফেলে।" (৮) বার্টন সাহেব কহিয়াছেন, "পূর্ব্ব আফ্রিকায় বিবেক নাই, এবং আত্মগ্লানি বলিতে মারাত্মক দুষ্কর্ম্ম করিবার সুযোগ হারান জন্য দুঃখ বুঝায়। ডাকাতি, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ; হত্যা যত নিষ্ঠুর ও নিশীথ-কালীন, তত ভাল—শূরের চিহ্ন।" (৯) মধ্য আফ্রিকা পর্য্যাটক পিথারিক সাহেব বলেন, "আমি রাক্ষসনাম-গর্ব্বিত নিমনামদিগের নিকটে শুনিয়াছি যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বৃদ্ধ বা মৃত্যুসমীপবর্ত্তী হয়, তাহারা বিনষ্ট এবং ভক্ষিত হইয়া থাকে।" (১০) পাল্‌বিড়ুসেলু আফ্রিকাস্থ নরমাংসাশী ফান্ এবং ওশিবা জাতির বর্ণনায় লিখিয়াছেন, তাহারা মনুষ্যভোজী

---

(৬) Herbert Spencer's Principles of Psychology Vol. I. p. 369.

(৭) Ethnological Journal 1869, p. 384.

(৮) Polynesian Researches Vol. I. p. 334.

(৯) Burton's First Footsteps in East Africa p. 176.

(১০) Egypt, the Sudan and Central Africa by John Petherick.

বলিয়া অহঙ্কার করে। (১১) ফিজি দ্বীপপুঞ্জবাসীরা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাক্ষস ছিল। (১২) অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত নবজিলণ্ড-নিবাসীরা অল্পদিন মনুষ্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে। (১৩) ভাষা এবং চিত্তের দরিদ্রতা নিবন্ধন ধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল ভ্যান্‌ডিমেন্ দ্বীপবাসী-দিগের বোধগম্য করান যায় না বলিয়া টাসমেনিয়ার ইংরাজ বিশপ নিক্সন তাহাদিগের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন চেষ্টায় বিরত হইয়াছেন। ভন্ রকাস্ বলেন যে নব কালিডনিয়া নিবাসীরা নির্লজ্জ, পশুবৎ বুদ্ধিবিশিষ্ট, নীতিবোধবর্জ্জিত, অবিশ্বাসী, মিথ্যাবাদী, নরমাংসাশী। (১৪) মরিজ উয়াগ্নর নামক বিখ্যাত পর্য্যটক লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ আমেরিকার কাহিবিরা মানবাহারী; এমন কি, নিজের সন্তান পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। (১৫) ব্রেজিলের অরণ্যস্থ আদিমনিবাসীদিগের সম্বন্ধে ডাক্তার রবার্ট আভিলালিমণ্ট কহেন, তাহারা উলঙ্গ, ব্রীড়াহীন, মনুষ্যভক্ষক, নীতিভাবশূন্য; যে জন তাহাদিগের বন্ধু সেই ভাল, যে মিত্র নয়, সে মন্দ। (১৬) আমেরিকার দাক্ষিণাংশস্থিত টিরাডেল্‌ফিউগো দ্বীপবাসীদিগের বিষয়ে ডিউক অব্ আর্গিল "আদিম মনুষ্য" নামক গ্রন্থে (১৭) লিখিয়াছেন যে, তাহারা বোধ হয়, সকল জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাহারা বিবস্ত্র ও নরমাংসাহারী; বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগুলিকে কুকুরাদির ন্যায় মারিয়া ভক্ষণ করে। ডারউইন্ বলেন, "যখন আমরা ঈদৃশ মনুষ্যগণকে দেখি, তখন তাহারা যে আমাদিগের সদৃশ জীব এবং এই ভূমণ্ডল-নিবাসী, এরূপ জ্ঞান করিতে কষ্ট হয়।" (১৮)

---

(১১) Explorations and Adventures in Equatorial Africa by Paul B. Du Chaillu.

(১২) Ibid Vol. IV. p. 322,

(১৩) Chamber's Encyclopedia Vol. II. p. 563.

(১৪) Man in the Past, Present and Future by L. Buchner. Translated into English by W. S. Dallas p. 315.

(১৫) Ibid p: 321,

(১৬) Journey through North Brazil 1856 by Dr. Robert Ave Lallemont.

(১৭) Primeval Man by Duke of Argyll p. 167.

(১৮) Darwin's Voyage of the Beagle.

চতুর্থতঃ, প্রাচীনদিগের অজ্ঞাত একটী নৈতিক নিয়মও যে বর্ত্তমান কালের সভ্যতম ইউরোপীয়েরা জানেন না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না", এই নীতিতত্বটী এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে জ্ঞানী মাত্রেরই নিকটে সমাদৃত হইতেছে। যদি "প্রাচীন" বলিতে ঐতিহাসিক গ্রীক, রোমক, য়িহুদী, হিন্দু, মৈসর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণই বুঝায়, তাহা হইলেও দেখান যায় যে, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াও তাঁহারা এ তত্বটী অবগত হইতে পারেন নাই। রাজনীতিগ্রন্থে আরিষ্টট্ল্ দাসদিগকে সমাজের অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করিয়াছেন। (১৯) রোমের ব্যবস্থাপকেরা দাসত্ব সংক্রান্ত কত কথা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং রোম ও গ্রীসে কৃষি প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য্য দাসদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত। মুসার ব্যবস্থা ও বাইবেলের অন্যান্য স্থল হইতে জানিতে পারা যায় যে, য়িহুদীদিগের মধ্যে দাসত্ব প্রচলিত ছিল। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে মনু বলেন, দাসত্ব শূদ্রোচিত কর্ম্ম; এবং হিরোডোটস্ মিসর দেশের দাসের উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাতন কোন সভ্যজাতির এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, যাহাতে দাসত্ব ন্যায়বিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বরং তদ্বিপরীত প্রমাণই ভূরি ভূরি লক্ষিত হয়।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে যে, যে গ্রীক্জাতি স্বাধীনতা প্রিয়তাগুণে অসংখ্য শত্রু দলন পূর্ব্বক জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া মানবমণ্ডলীর দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যে জাতির পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে করিতে স্বতন্ত্রতা ও শৌর্য্যরসে অভিষিক্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি সকল উন্নত ও নবস্ফূর্ত্তিসম্পন্ন হয়, সে জাতিও দাসত্ব কলঙ্কে দূষিত ছিল এবং সে কলঙ্ককে কলঙ্ক বলিয়া বোধ করিতে কখনও সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা জানেন যে স্বশ্রেণী বা স্বজাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে যে সময় লাগে, সমগ্র মানব জাতির সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে তদপেক্ষা কত অধিক সময় আবশ্যক, তাঁহারা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, স্বশ্রেণী বা স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান সত্বেও সমুদায় মনুষ্য সম্পর্কীয় কর্ত্তব্য বোধ উদিত না হইবার কারণ কি? বিসদৃশ প্রতীয়মান পদার্থের নিচয়ের সাদৃশ্য নির্ণয় দ্বারাই তাহাদিগের এক নিয়মের অধীন বলিয়া জানা যায়

(১৯) See Aristotle's Politics.

জ্ঞান বৃদ্ধি সহকারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাহ্য বৈলক্ষণ্য সমুদায়ের অভ্যন্তরে মূল প্রকৃতিস্থ সমতা যত লক্ষিত হইতেছে, দিন দিন যত প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বজাতির ন্যায় সমস্ত নরজাতির সুখদুঃখের সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির সুখদুঃখ সম্বন্ধ রহিয়াছে, ততই সাধারণ নৈতিক তত্ত্বের বিকাশ হইতেছে।

পঞ্চমতঃ, যদি "প্রাচীনেরা" বলিতে অতি পূর্ব্বকালীয় অনৈতিহাসিক সময়ের লোক বুঝায়, তাহা হইলে প্রমাণ করা যায় যে, তাঁহারা নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালীয় সভ্যজাতিগণাপেক্ষা অনেক দূর অনভিজ্ঞ ছিলেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বিবাহই সমাজের পত্তনভূমি। বিবাহ হইতেই পরিবার,—পতিপত্নী, পুত্রকন্যা, পিতামাতা, ভ্রাতাস্বসা, জামাতা, বধূ, মধুরতা-ময় পবিত্রভাব ধারণ করিয়াছে। বিবাহ হইতেই দম্পতিপ্রেম, মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রণয় প্রভৃতি স্বর্গীয় সামগ্রী সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে বিবাহ ছিল না, সকলেই পশুবৎ যদৃচ্ছা বিহার করিত ইহার প্রমাণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি, মহাভারত পাঠে জানা যায় "পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরুদ্ধ, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারিণী ছিল।" ভারতবর্ষে ইহার অনেক চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মালাবারের নায়রদিগের মধ্যে মহিলাগণ স্ববর্ণে বিহার করিয়া থাকেন। কে তাহার পুত্র কেহই বলিতে পারে না; সুতরাং ভাগিনেয় মাতুলের বিষয়াধিকারী। অযোধ্যায় তিহুরদিগের মধ্যে এইরূপ স্বচ্ছন্দ বিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে আরও লিখিত আছে যে, "উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে।" (২০) উত্তর কুরু বলিতে প্রাচীন আর্য্যগণ ভারতভূমির উত্তর কোন পুণ্যময় দেশ বুঝিতেন। বোধ হয়, ইহা আদিম আর্য্যদিগের বাসস্থল হইবে। তাহা হইলে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, অতি পূর্ব্বকালের আর্য্যপিতৃগণ যথেচ্ছবিহারী ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকজাতির ইতিহাস দ্বারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হয়। গ্রীক্ পুরাবৃত্ত লেখকগণ পুরাতন শ্রুতি অবলম্বন করিয়া বলেন যে, সিক্রপ্‌স্ গ্রীস্‌দেশে বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত করেন। প্লুটার্ক স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, রোমকদিগের মধ্যে বন্ধুদিগকে স্ত্রী প্রদান করা রীতি ছিল।

---

(২০) মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়।

অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ যে সর্ব্বসাধারণের ভোগ্য সামগ্রী ছিল, বর্ণিত আচার ব্যবহারে তাহার কোন কোন নিদর্শন পাওয়া যায়। বিবাহ-প্রণালী বদ্ধমূল হইলেও স্বামী সহবাস সুখলাভ করিবার পূর্ব্বে কোন কোন দেশে একদিনের জন্য মহিলাগণ সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। হোরোডোটস্ লিখিয়াছেন যে, ব্যাবিলনীয়াতে কোন স্ত্রীলোক একবার রতি মন্দিরে না থাকিয়া বিবাহ করিবার অনুমতি পাইত না। (২১) ষ্ট্রাবো বলেন, আর্ম্মিনিয়াতেও এই নিয়ম ছিল। (২২) ডুলরি সাহেবের মতে কার্থেজে এবং গ্রীসের কোন কোন অংশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সাইপ্রস দ্বীপে, ইথিওপিয়ায়, লিডিয়ায়, ঈদৃশ রীতির চিহ্ন লক্ষিত হয়। (২৩) ডাওডোরস্ সিকুলস্ কহেন, মেজর্কা, মাইনর্কা, আইভিকা দ্বীপে বিবাহ রাত্রে পাত্রী উপস্থিত অতিথিবর্গের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। (২৪)

চীনেরা বলে, তাহাদিগের দেশে ফৌহির সময়ে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। হেরোডোটস্ কহেন যে, মাসাজেটি এবং ইথিওপিয় অসেস্ জাতি বিবাহ কাহাকে বলে, জানিত না। মাসাজেটিদিগের বিষয়ে বিখ্যাত ইতিবৃত্ত ও ভূগোলবিৎ ষ্ট্রাবোও এই কথা লিখিয়াছেন। (২৫) মিসরদেশেও উদ্বাহপদ্ধতি প্রারম্ভের জনশ্রুতি ছিল। (২৬)

এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, সভ্যতম জাতি-গণও এক সময়ে বিবাহপ্রথাশূন্য ছিলেন। কিন্তু আর্য্যবংশোদ্ভূত হিন্দু, গ্রীক্ ও রোমকগণ, কি সৈমকুলকেশরী ব্যাবিলোনীয় এবং কার্থেজীয় বা ফিনিসীয় জাতি, কি আফ্রিকাশিরোরত্ন মৈসরনিকর, কি তুরাণবংশচূড় চীনজাতি, কেহই অতি পূর্ব্বকালে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হইতেন না। এত-দ্ব্যতিরিক্ত অনেক অসভ্যজাতির মধ্যে গ্রীস্ এবং রোমের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে বিবাহ-প্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও দৃষ্ট হইতেছে। বোর্ণিও

---

(২১) Herodotus, Clio, 199.
(২২) Strabo, Lib. 2.
(২৩) Lubbock's Origin of Civilization p.100 2nd Ed.
(২৪) Ibid p. 101.
(২৫) Ibid p. 70.
(২৬) Buchner's Man in the Past, Present and Future p. 326

দ্বীপের অরণ্যবাসী ও আফ্রিকার মধ্যস্থ ডোকো প্রভৃতি অসভ্যতম জাতি আদিমাবস্থা অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে শিখে নাই, পরিবার কাহাকে বলে জানে না, পশুবৎ স্বচ্ছন্দ বিহার করে। (২৭) অপেক্ষাকৃত উন্নত আমেরিকার আপাচীরাও বিবাহ বুঝে না; কিছু দিনের জন্য স্ত্রীপুরুষে একত্র থাকে, সন্তানগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলেই স্বদেশীয়-দিগের দলে মিশিয়া যায় এবং জনক জননীর অপরিচিত হইয়া পড়ে। (২৮) নারীগণ যে পূর্ব্বকালে সর্ব্ব-সাধারণের ভোগ্যবস্তু বলিয়া গণ্য হইত, অসভ্য-দিগের কোন কোন আচার দৃষ্টে তাহা অনুমিত হইতে পারে। গ্রিন্‌লণ্ডের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে ইজিডি সাহেব লিখিয়াছেন, এস্কিমোদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অম্লানবদনে বন্ধুদিগকে স্ত্রী-দান করিতে পারে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অমায়িকস্বভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। (২৯) এস্কিমো, আদিম আমেরিকগণ, পলিনেসীয়েরা, অষ্ট্রেলিয়াবাসীরা, নিগ্রোনিচয়, আরবেরা, আবিসিনীয়, কাফ্রি এবং মোগলেরা, যে কেহ তাহাদিগের নিকটে অতিথি হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্ত্রী দিয়া থাকে; এবং ইহা না করিলে তাহাদিগের বিবেচনায় আতিথ্য ভঙ্গ হয়। (৩০)

অতি পূর্ব্বকালে যে লোকে কেবল বিবাহশূন্য ছিল, এমত নহে; মনুষ্য মারিয়াও ভক্ষণ করিত। যে নর আহারসামগ্রী বলিয়া গণ্য হইত, সেই নর ভালবাসার সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইতেছে। একি অল্প নৈতিক উন্নতির চিহ্ন? আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, সকল দেশেই নর-বলি প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ আছে; এবং যেখানে নরবলি প্রদত্ত হইত, সেই খানেই কোন না কোন সময়ে নরমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল; কারণ লোকে যাহা সুখাদ্য জ্ঞান করে, আহারার্থে তাহা দিয়াই দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। আদিম কালের মানবজাতির অবস্থা যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনিই তাৎ-কালিক রাক্ষসত্ব লক্ষণ স্বীকার করিবেন। কোম্‌তের মতে আদৌ

---

(২৭) Buchner's Man in the Past, Present and Future p. 326.
(২৮) Ibid 323.
(২৯) Egede's History of Greenland p. 142.
(৩০) Lubbock's Origin of Civilization p. 102.

মনুষ্য নরমাংসাশী ছিল। (৩১) বুকনর বলেন, "ভগ্ন ও দগ্ধ মনুষ্যাস্থির যে বহুসংখ্যক আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐতিহাসিক সময়ের অধিকাংশ অসভ্য জাতিদিগের ন্যায় অনৈতিহাসিক ইউরোপবাসিগণ মানবভোজী ছিল।" (৩২) অদ্যাপি যে কোন কোন অসভ্যজাতির মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ চলিতেছে, ইহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। আফ্রিকাস্থ নিম্নাম্, ফান্ এবং ওসিবাজাতি, আমেরিকার কাহিবি, ব্রেজিল-বাসী ও টেরাডেল ফিউগো নিবাসিগণ, ফিজি, নব কালিডনিয়া প্রভৃতি দ্বীপাবাসীধিসকল, ইহার দৃষ্টান্তস্থল। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে যে রাক্ষস ছিল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির বর্ণনা দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক্ পুরাবৃত্তবিদ্ হেরোডোটস্ মাসাজিটি নামক মধ্য আসিয়াস্থ জাতিবিষয়ে বলেন যে, যখন কেহ তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ হইত, তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে মারিয়া আহার করিত। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক সেণ্ট জেরোম লিখিয়াছেন যে, যখন তিনি বাল্য-কালে গল্ প্রদেশে ছিলেন, ব্রিটেন নিবাসী স্কটদিগকে নরমাংস ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন। (৩৩)

অসভ্য জাতিগণের অবস্থা হইতে সভ্যজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থা অনেক দূর অনুমিত হইতে পারে; কারণ সভ্যজাতিগণ যে সকল সামাজিক সোপান অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, অসভ্যজাতিগণ তাহার কোন না কোনটায় পড়িয়া আছে। এই জন্যই আমরা মনুষ্যের আদিমাবস্থা বুঝিবার নিমিত্ত অসভ্য জাতিদিগের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিলাম।

ষষ্ঠতঃ, "পরের ভাল করিবে; পরের উপকারার্থে আপনার বাসনা বিসর্জ্জন করিবে; প্রতিবেশিগণকে আত্মবৎ ভালবাসিবে; শত্রুদিগকে ক্ষমা করিবে, ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে; পিতামাতাকে ভক্তি করিবে; উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে মান্য করিবে"; এই সকল উপদেশ হিন্দু, গ্রীক্, রোমক, য়িহুদী প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতিগণের মধ্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধের মধ্যে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে

(৩১) See Miss Martineaus Translation of Positive Philosophy Vol. II. p. 186.

(৩২) Buchners Man in the Past, Present and Future p. 261.

(৩৩) Chamber's Encyclopedia Vol. II. p. 563.

যে, অদ্যাপি এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহারা এই সকল নীতিতত্ত্ব অবগত নহে এবং পূর্ব্বে এমন এক কাল ছিল, যখন এ সমুদায় সত্য কি হিন্দু, কি গ্রীক্, কি রোমক, কি য়িহুদী, কাহারও চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয় নাই। যখন মনুষ্য মনুষ্যের আহার ছিল, যখন নরগণ ছলে বলে কৌশলে কোন নারীকে নিজায়ত্ত করিয়া পশুবৎ বাসনা পরিতৃপ্ত করিত, যখন পতি-পত্নী, পিতামাতা, এ সকল সুধাময় শব্দ শ্রুত হইত না, তখন কাহার মনে এই সমস্ত নৈতিক উপদেশ প্রকাশিত বা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারিত? বাস্তবিক অনেক দূর সভ্য না হইলে কেহ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারে না; এবং প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক্, রোমক এবং য়িহুদীদিগের অপেক্ষা বর্ত্তমান কালীয় ইউরোপীয়গণ সভ্যতাবর্ত্মে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই বলিয়াই নীতিতেও অধিক উন্নতি দেখাইতে পারিতেছেন না। তথাপি আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না," অর্থাৎ "সকল মনুষ্যকেই স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে" এই নীতিতত্ত্বটী প্রাচীনেরা জানিতেন না, নব্যেরা আবিষ্কার করিয়াছেন।

সপ্তমতঃ, মহামূর্খ বা বঞ্চক বলিয়া অভিহিত হইবার ভয় থাকিলেও, আমরা স্বীকার করিতে পারি না যে, খৃষ্টধর্ম্ম কোন নূতন নীতিতত্ত্ব প্রকাশ করে নাই। ঈশার মতে প্রীতি ভিন্ন ধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর প্রেমে এবং মানব প্রেমে অভিষিক্ত হও, সম্পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে অভিষিক্ত হও, তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। যে পিতামাতাকে তুমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভাল বাস, তাঁহাদিগের আজ্ঞা যেমন উৎসাহচিত্তে যত্নের সহিত পালন কর, তেমনি ভাবে ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চল। স্নেহময়ী ভগিনী বা প্রাণোপম ভ্রাতার মঙ্গল সাধন জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও ব্যগ্রতা সহকারে আপনি অনেক কষ্ট সহিয়াও চেষ্টা করিয়া থাক, প্রত্যেক মনুষ্যের সম্বন্ধে তদ্রূপ করিবে; সে তোমার যত কেন অপকার করুক না, সে তোমার যত কেন শত্রু হউক না, সে যত কেন পাপপঙ্কে নিমগ্ন হউক না, কেবল বাহ্য কার্য্যে নয়, অন্তরের প্রতি তন্তুতে, এই সর্ব্বতঃপ্রসারী প্রেম ব্যাপ্ত থাকিবে, তাহা হইলে তুমি ধার্ম্মিক হইবে, নতুবা নয়। এই-রূপে মনুষ্যের সমস্ত কর্ত্তব্য একমাত্র প্রীতিতে পরিণত করিয়া ঈশা আমাদিগের বিবেচনায় সর্ব্বোচ্চতম নৈতিক নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন। এই সামান্য নিয়মেই পূর্ব্বাবিষ্কৃত বিশেষ বিশেষ নৈতিক নিয়ম পর্য্যবসিত

হইয়াছে; এবং ইহাতেই উত্তরকাল সমুদ্ভাবিত নীতিতত্ত্ব সকলের মূল নিহিত রহিয়াছে। "পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না, পরদারা হরণ করিবে না, মিথ্যা কথা কহিবে না, শত্রুকে ক্ষমা করিবে, প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ ভাল বাসিবে," প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীন কালের নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন নদীর ন্যায়, একমাত্র সর্ব্বভৌম প্রেম সাগরে লীন হইয়াছে; এবং "কাহাকেও দাস করিয়া রাখিবে না," সকলকেই সুখভোগে সমান স্বত্ববান্ বোধ করিবে," ইত্যাদি বর্ত্তমান সময়ের নীতিতত্ত্ব সকলও সুধাকর ও কমলার ন্যায় প্রীতিসিন্ধুর মন্থনে উত্থিত হইয়াছে; কেননা যে তোমার ভ্রাতা, সে কি তোমার দাস হইতে পারে? সে যে সমান স্বত্বাধিকারী।

এই প্রবন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, নীতি-জ্ঞান সম্বন্ধে অসভ্যজাতিদিগের অপেক্ষা সভ্যজাতিগণ, এবং প্রাচীনদিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়গণ শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে নীতির উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।

সমাপ্ত।